পূজাবার্ষিকী ১৪৩২

বঙ্গশারদীয়া

Dresden, Germany

Issue · October · 2025

প্রচ্ছদ চিত্র - কাজরী মজুমদার
শেষের প্রচ্ছদ - সোহম ঘোষ
পটভূমি চিত্র - অর্ক বক্সী
সম্পাদনা এবং সংকলন - তিয়াস সামুই, অর্ক বক্সী
পত্রিকা সমিতি - তিয়াস সামুই, প্রনয় মন্ডল, অর্ক বক্সী

Front Cover - Kajari Mazumder [Acrylic on Canvas]
Back Cover - Soham Ghosh [Charcoal & Sketch Pen on White Board]
Watermark design - Arka Baksi [Pen on Paper]
Editing and compilation: Tias Samui, Arka Baksi
Magazine Committee: Tias Samui, Pranay Mandal, Arka Baksi

© BongoUstav Dresden (BUD) e.V.

I. সভাপতির কলমে

বাঙালি তার বৈচিত্র্যে অনন্য। সে তার ভাষা হোক বা দৈনন্দিন খাদ্যাভাস কিংবা তার রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি বা ধর্মনীতি - সবেতেই যেন তার নিজস্বতার ছাপ।

আজকের দিনে পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে আমাদের জীবনযাত্রা অনেকটাই বদলে গেছে। জীবন - জীবিকা ও উন্নত তথ্য প্রযুক্তির কারণে ভৌগোলিক দূরত্ব কমলেও সম্পর্কের দূরত্ব হয়তো বেড়ে চলেছে ক্রমাগত। আজ আমরা পরিণত হয়েছি নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে। আর সেই কারণে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আমাদের ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি অনেকটাই অজানা থেকে যাচ্ছে। একাকিত্ব, অসহায়তা এবং মানসিক বিভ্রান্তি যেন আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে গ্রাস না করে সঠিক পথের দিশা এনে দেয় ,আর শুধু তাই নয়, সমাজের প্রতি দায়িত্বশীলতা, সময়ে - অসময়ে পরস্পরের পাশে দাঁড়ানো , সর্বোপরি আমি বা আমার থেকে আমরা বা আমাদের এই লক্ষ্যে পৌঁছানো - এই উদ্দেশ্য নিয়ে ২০১৯ থেকে আমাদের যে পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২৫ এ এসে তার প্রসারতা অনেক গুন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে।

আমাদের বঙ্গোৎসব কমিটির পক্ষ থেকে ড্রেসডেনে ২০১৯ সাল থেকে সার্বজনীন দুর্গোৎসবের আয়োজন করে আসা হচ্ছে। এই দুর্গোৎসবের জনপ্রিয়তা আজ শুধুমাত্র ড্রেসডেন কিংবা এখানকার বাঙালি সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—জার্মানির বিভিন্ন শহর ছাড়াও ইউরোপের নানা প্রান্ত থেকে বহু মানুষ প্রতি বছর এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আমাদের আয়োজনকে এক বিশেষ উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে।

দুর্গাপূজা, সরস্বতীপূজা ও লক্ষ্মীপূজার পাশাপাশি, বাংলা নববর্ষ, রবীন্দ্রজয়ন্তী, এসকার্শন, গ্রিল পার্টি ইত্যাদি অনুষ্ঠানসমূহ আমাদের কমিউনিটির সদস্যদের মধ্যে এক অদম্য আনন্দ, আন্তরিকতা ও সহযোগিতার বন্ধন গড়ে তুলেছে। যেটা সত্যি দৃষ্টান্তমূলক এবং ভীষণভাবে প্রশংসনীয়।

বাঙালির চিন্তা ও চেতনায় প্রায়শই এক সাংস্কৃতিক ও শৈল্পিক স্বত্তার সমাবেশ দেখা যায়। সুপ্ত থাকলেও সময় ও চাহিদার প্রয়োজনে তার প্রকাশ ঘটে। গত ৩ বছর ধরে আমাদের বঙ্গোৎসব কমিটির পক্ষ থেকে প্রকাশিত ম্যাগাজিনে আমাদের সদ্যসবৃন্দের এবং তাদের পরিবার ও পরিচিতদের লেখা গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী এবং চিত্রাঙ্কন সবটাই প্রচন্ড আন্তরিকতা ও সাবলীলতায় ভরা। এছাড়াও জার্মানিতে বসবাসের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে, আমাদের ম্যাগাজিনে বাংলা ও ইংরেজির পাশাপাশি জার্মান ভাষাকেও বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমাদের বেশ কিছু জার্মান বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে এই প্রকাশনায় তাদের লেখা পাঠিয়েছেন এবং আগ্রহভরে এতে অংশ নিয়েছেন। শুধু লেখালেখিতেই নয় - আমাদের আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলোতেও তাদের সরব উপস্থিতি ও সক্রিয় অংশগ্রহণ সত্যিই উল্লেখযোগ্য। বলাই বাহুল্য যে দিনে দিনে আমাদের এই ম্যাগাজিনের গুণগত মান শুধু উন্নতই হচ্ছে না, পাশাপাশি আগামী দিনে এই ম্যাগাজিন আমাদের সকলের মিলিত কর্মকান্ডের দলিল হয়ে উঠে এঁকে এক অনুপম উজ্জ্বলতায় পৌঁছে দেবে সন্দেহ নেই।

এই কয়েক বছরের মধ্যেই আমাদের সংগঠন শুধুমাত্র ড্রেসডেন বা জার্মানিতেই নয়, বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা অন্যান্য বাঙালি সংগঠনগুলোর মধ্যেও একটি স্বতন্ত্র পরিচিতি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে, সেটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের। তবে আমাদের যাত্রাপথ এখানেই শেষ নয়, বরং এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। ভবিষ্যতে যাতে আমাদের এই সংগঠন বিশ্বের বাঙালি সংগঠনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান

অধিকার করতে পারে , সেই লক্ষ্যে আমাদের একজোট হয়ে কাজ করতে হবে। এই দায়িত্ব এবং কর্তব্য আমাদের প্রত্যেকের । বাঙালি সম্বন্ধে একটি প্রচলিত কথা প্রায়ই শোনা যায় -" বাঙালি একাই একশো , কিন্তু একশো বাঙালি এক হতে পারে না " বাঙালি সম্পর্কে এই ধারণাকে ভুল প্রমানিত করতে সবসময় যেন আমরা বদ্ধপরিকর থাকি। কোনো রকম ব্যক্তি স্বার্থ নয় বরং সমষ্টি স্বার্থই হোক আমাদের একমাত্র অভিপ্রায়।

আজকের পৃথিবীতে, যুদ্ধের অভিঘাতে মানবতা যেখানে প্রতিনিয়ত প্রতিকূলতার সম্মুখীন, সেখানে সমস্ত রকম ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতার বন্ধন ছিন্ন করে উপনিষদের সেই চিরন্তন ও শাশ্বত মন্ত্র ধ্বনিত হোক আমাদের মনে ও প্রাণে - "শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃততস্য পুত্রাঃ"। আমরা সবাই অমৃতের সন্তান - দেশ, ভাষা , জাতি,ধর্ম এসব কিছুর গন্ডি পেরিয়ে বিশ্ব-মানবতার লক্ষে পৌঁছানোই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। শুধু তাই নয়, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চিন্তা-চেতনাতেও যেন আমরা সেই সমৃদ্ধির বীজ বপন করে যেতে পারি - এটাই হোক আমাদের একান্ত কাম্য।

পাপিয়া দাস
সভাপতি
বঙ্গোৎসব ড্রেসডেন

I. Foreword from the President

Bengalis have always been credited for holding onto their roots wherever in the world they live. The saying goes that you can take a Bengali out of Bengal but not the Bengal that resides in the heart of a Bengali. Our Bongoutsav Dresden Community can vouch for this. In 2019 we started with a small Durga Puja celebration in an effort to introduce our future generations - kids who were growing up in Germany - to our bengali culture and heritage. Since then our organisation has grown steadily. We have become more in number, celebrate more together and have successfully created a niche that feels like home. We have become an important representative of Culture and Heritage in Dresden and Germany. This magazine has been an integral part of our journey serving as a chronicle of our expanding efforts. As I wish the magazine all the best I also hope that like our community and organisation, Bongosharodiya also goes from strength to strength. Wish you all a Happy Durga Puja and as always 'Ashche bochor abar hobe' or let the wait for next year not be too long.

Bengalen sind seit jeher dafür bekannt, dass sie überall auf der Welt an ihren Wurzeln festhalten. Es heißt, man könne einen Bengalen aus Bengalen herausholen, aber nicht Bengalen aus dem Herzen eines Bengalen. Unsere Bongoutsav Dresden Community kann dies bestätigen. Im Jahr 2019 begannen wir mit einer kleinen Durga-Puja-Feier, um unseren zukünftigen Generationen – Kindern, die in Deutschland aufwachsen – unsere bengalische Kultur und unser Erbe näherzubringen. Seitdem ist unsere Organisation stetig gewachsen. Wir sind zahlreicher geworden, feiern mehr gemeinsam und haben erfolgreich eine Nische geschaffen, in der wir uns zu Hause fühlen. Wir sind zu einem wichtigen Vertreter von Kultur und Erbe in Dresden und Deutschland geworden. Dieses Magazin ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Reise und dient als Chronik unserer wachsenden Bemühungen. Ich wünsche dem Magazin alles Gute und hoffe, dass Bongosharodiya ebenso wie unsere Gemeinschaft und Organisation immer stärker wird. Ich wünsche Ihnen allen ein frohes Durga Puja-Fest und wie immer „Ashche bochor abar hobe“ oder möge das Warten auf das nächste Jahr nicht zu lang sein.

Papiya Das
President
Bongoustav Dresden e.V.

II. Foreword from the Secretary

I can still feel the vibrant energy of last year's Puja, when our community came together in one of the largest gatherings Dresden has ever seen. Standing in that joyous multitude, I witnessed more than just a successful festival—I saw a family, thriving together. It was a powerful reminder of the journey we began in 2019 with just a handful of dreamers, a journey that has now blossomed through seven autumns.

That journey has also been my own. From arriving in this city just weeks before our very first Puja, to being part of the committee I have witnessed the struggles of bringing our first ever idol, shared in the triumphs, and found my truest connections in the fragrance of the *bhog* being cooked or in the collective effort of setting up our pandal.

They say the scent of *Shiuli* flowers is the essence of *Sharodiya*. The flower blooms with all its heart for only a brief moment, yet its fragrance lingers long after. To me, each Puja feels the same—an exquisite and fleeting bloom in the landscape of our year. It asks us to be fully present, to give it our whole heart.

This year, more than ever, I feel called to celebrate or rather live Puja with that same intensity. Let us not simply attend, but truly absorb every moment. Let us carry the rhythm of the *Dhaak* in our memories, cherish every conversation with old and new friends alike, and hold the divine image of Durga Ma close to our hearts. May this year's celebration become a vivid snapshot—a fragrance so enduring that it stays with us for years to come.

Life, much like the Elbe that flows steadfastly through our city, is always in motion, carrying us to unknown shores. We do not know what lies ahead. But the family we have built here, and the memories we have created in the warmth of this festival, are anchors for the heart. They become part of our story, no matter where the journey leads us.

So let us come together once again, and make this Puja the most unforgettable one yet.

Shubho Sharodiya!

Jyotirmaya Ijaradar
Secretary
Bongoustav Dresden e.V.

Why We Belong: Echoes of Bengal and the Spirit of BUD

A report of the activities of BUD e.V.
Executive Committee 2025

Every community thrives on shared experiences, and Bongo Utsav Dresden (BUD) e.V. has become a vibrant hub where traditions meet togetherness. Membership at BUD is not just about attending events—it is about being part of a family that celebrates culture, knowledge, food, and friendship in the heart of Dresden. Looking back at the past year, one can see how becoming a member means becoming part of a journey that keeps the spirit of Bengal alive abroad.

Sharodutsav 2024 and Bijoya Sammilani

One of our most anticipated event in the last year—Sharodutsav 2024. Held over three festive days, the celebration drew a record-breaking 1,400 participants, making it the largest BUD event to date. Devotional rituals, soulful cultural performances, and a bustling food court created an atmosphere reminiscent of Bengali's puja pandals. The celebration concluded with a grand Bijoya Sammilani, where members and guests gathered over authentic Bengali delicacies like Mutton Kasha and Katla Kalia. More than just a meal, it was a symbol of warmth and unity, reminding us that BUD is a home away from home.

Christmas Party 2025

The spirit of inclusivity continued into the winter season with our Christmas Party. Sparkling lights, festive music, and a joyful exchange of food and laughter brought members together beyond cultural boundaries. It was a reminder that BUD embraces not just Bengali traditions, but also the universal joy of celebrating life together.

Science and Technology Day 2025

Membership at BUD is not limited to cultural festivities—it also opens doors to intellectual exploration. At our Science & Technology Day 2025, curiosity and creativity filled the air as members presented experiments, shared ideas, and inspired participants of all ages. Children and adults alike engaged in hands-on activities, while discussions highlighted the importance of knowledge-sharing in today's world. After the program, everyone enjoyed a delicious spread of Biryani and Chicken Chaap, proving once again that food and learning are the perfect pair.

Barshobaron and Rabindra Jayanti 2025

The arrival of spring marked a special celebration as BUD members gathered in Cotta to welcome the Bengali New Year (Pohela Boishakh) while also paying tribute to the timeless legacy of Rabindranath Tagore. The day was filled with music, poetry, and laughter, as members performed recitations, songs, and dances inspired by Tagore's works, adding a cultural richness to the festivity. Barshabaran

is never complete without food, and this year's spread was truly memorable. The highlight of the menu was the much-loved Sorshe Ilish (Hilsa in mustard sauce), accompanied by a variety of home-style bhorta—including Chingri (prawn), Kachki (small fish), and Begun (eggplant)—that delighted everyone with their authentic flavors. Other favorites included Chicken Kosha, Mug Dal with Murighonto, and the grand finale, a sweet serving of Roshomalai. It was a day where tradition met togetherness—celebrating not just the Bengali New Year, but also the enduring spirit of Rabindranath Tagore, whose words and melodies continue to connect us across time and distance.

Potluck and Sports Activity 2025

Community spirit took center stage at our Potluck and Sports Activity Day, where laughter echoed across the park. Fun-filled games like the biscuit race and the marble and spoon race brought back the nostalgia of childhood, while the potluck feast showcased homemade specialties from members' kitchens. These small yet meaningful gatherings truly reflect the warmth of BUD membership. Following the potluck, the BUD football team continued its tradition of playing weekly football matches.

Hike and Excursion 2025

We love to go hiking as well. This year we had a lovely hike to Lochmühle in Lohmen where we walked along the stream under a canopy of trees. The stars of this show were our little members who not only declared that the hike was easy but also demanded that 5 km planned route was not enough and should be extended next time. We finished strong with a cold beer for the adults and some juice for the kids.

Summer Barbecue 2025

Every year, BUD marks the end of summer with a joyful BBQ by the Elbe River, and 2025 was no exception. Members came together to enjoy a wide variety of grilled delights—from flavorful lamb shashlik to fresh vegetarian options that catered to every taste. To keep the spirit high, BUD provided chilled beer and refreshing non-alcoholic drinks, ensuring that everyone could relax and enjoy the afternoon. With good food, laughter, and the scenic riverside setting, the event once again captured the true essence of community and togetherness.

More Than Events: A Way of Life

Beyond these highlights, BUD also hosts occasional meetings and informal get-togethers—because togetherness is part of our culture. From festive celebrations like Durga Puja to casual afternoons, every event strengthens bonds and brings comfort to those living far from home. Becoming a member of BUD is more than joining an organization—it is about finding a community where tradition thrives, friendships flourish, and every gathering feels like family.

So, why become a member of BUD? Because here, every moment—whether through rituals, food, music, science, or simple laughter—is a celebration of belonging. And if you'd like to join us, simply scan the QR code to become part of our community.

Peace - Benita Sarkar [Acrylic on Canvas]

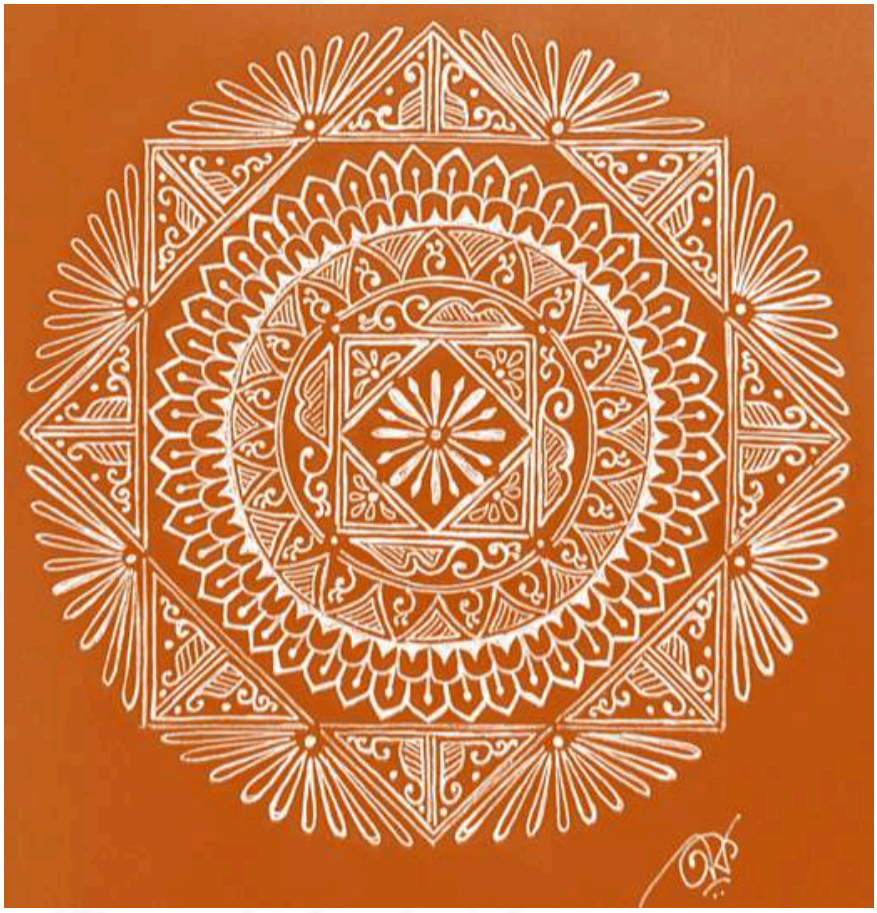

A traditional ‘Alpona’ (painted motif)

সম্পাদকীয়

মনে পড়ে ছোটবেলার দুর্গাপুজোর দিনগুলো? সারাদিন প্যান্ডেলে হই-হুল্লোড় করলেও রাত্রিবেলা কিন্তু বাড়ি ফিরে আসতে হতো। পুজোর কটা দিন রাতে শুতে যাবার অল্প বিস্তার ছাড় থাকলেও সারারাত জাগার অনুমতি কখনোই পাওয়া যেত না। বাইরে রাস্তায় তখনো পুজোর ভিড় - যতই পর্দা টানা অন্ধকার ঘরে শুয়ে থাকা হোক না কেন- ঘুম কি আর আসতে চায়! মা-বাবা চলে গেলে আরো কিছুক্ষন চুপ করে শুয়ে থাকা - তারপর আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে জানলা অব্দি যাওয়া- তারপর পর্দা টা একটু ফাক করে উঁকি দিয়ে রাস্তার মানুষ জনকে দেখা। এই মানুষের ঢল কে দেখতে দেখতে আমরা কখন মনের খোলা পৃথিবীতে হারিয়ে যেতাম তা খেয়াল থাকতো না। সেই পৃথিবীতে সারারাত ধরে ঠাকুর দেখা যায়, মা দুগ্গার সাথে পা ছড়িয়ে গপ্প করা যায়, সিংহের কেশরে চিরুনি চালানো যায়, কাতু দাদার সাথে ময়ূরে চড়ে তীর ধনুকও চালানো যায়, আবার স্বরদির সাথে একটু গান বাজনা ও করা যায়।

যারা আমাদের এইবারের পত্রিকাটি একটু উল্টেপাল্টে দেখেছেন তারা হয়তো বুঝতে পারবেন আমাদের প্রচ্ছদ এর পেছনের ভাবনাটি। আমাদের এই ক্ষুদ্র পুজোবার্ষিকীর প্রচেষ্টা থাকে, সুদূর বিদেশে কর্মযজ্ঞে ক্লান্ত কিছু মানুষের এই কল্পনার জগতের দরজার তালাটাকে চিরকালের মত ভেঙে দেওয়ার। কিছুটা সময়ের জন্য হলেও চলুন না একটু দুর্গা মণ্ডপে মাকে দেখে ‘আমার আমিকে’ নিয়ে

ম্যারাথন এ দৌড়ে আসি। সেখান থেকে মুক্ত হয়ে, আধুনিক সভ্যতা ছেড়ে দুপুর বেলা না হয় মার সাথে একটু গল্প করলেন। মনে হয় ভালই লাগবে। আর কথা বাড়ালে ভূতের রাজা বরের বদলে কিল মারবেন।

তাহলে শেষে বলি আমাদের বঙ্গশারদীয়া ২০২৫, পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করলো। যারা এই যাত্রায় আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবার অপেক্ষা আপনাদের কেমন লাগলো তা জানার। পড়ে জানাবেন কিন্তু...

We are back with our fourth edition of our annual magazine. This year we bring to you a kaleidoscope of writings that capture the spirit of the festive season. We would like to thank each and every person who contributed - without you we would never have managed to even dream of putting a magazine together. We hope that each of you enjoy this edition as much as we enjoyed reading and compiling all the submissions. We wish you a happy and prosperous year ahead. Until next time...

Magazine Committee
Bangosharodiya
2025

The Mother arrives to Dresden- Sayantan Dey [Pencil on Paper]

সূচিপত্র

দুর্গা পূজার গল্প - স্বামী স্তবপ্রিয়ানন্দ	1 -19
AnsprechBar – das 2025er Projekt – sprachbegabt, international, künstlerisch, lebensnah - Rosa Hauch und Yvonn Spauschus	21-22
আধুনিক সভ্যতা - পাপিয়া দাস	23
আমার আমি - পাপিয়া দাস	23
In Memory of My Mother - Mita Mitra	27-32
মুক্তি - অনিকেত রায়	33-34
Laufbericht zum 44. Columbus Marathon, 20.10.2024 - Rosa Hauch	35-36
দুপুর হলেই - চন্দ্রাশিস রায়	39-43
নারী - অনিকেত রায়	45
প্রতিশ্রুতি - রাজীব সরকার	45
হেঁসেলের খাতা থেকে ভোগের লাবড়া - বৈশালী ব্যানার্জি	47
Die Nalanda-Universität und Varanasi: Eine Reise in das alte Wissen und die Ewigkeit - Aranyasom Das	49-50
এমনটা কথা ছিলো না - সৌম্য তথাগত সুর	51
অবতার - সতী মৈত্র	51
বিবর্তন - রাজীব সরকার	51
"লাইক, শেয়ার আর সময়ের মৃত্যু!" - প্রলয় তারণ দাস	53-59
ঘরে ফেরা - পাপিয়া দাস	63-66

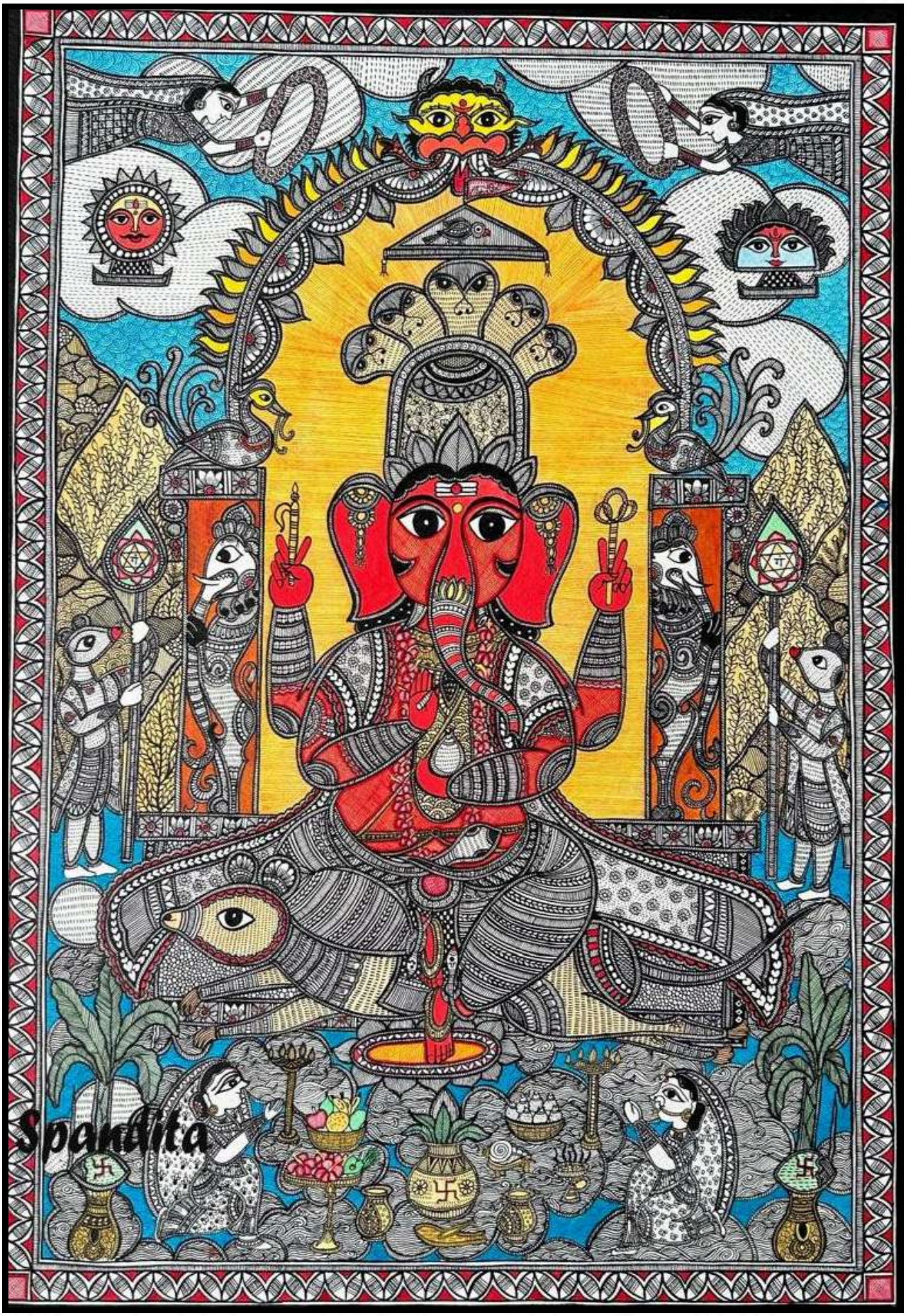

Vighnaharta - Spandita Chakraborty [Paint on Paper]

দুর্গা পূজার গল্প

স্বামী স্তবপ্রিয়ানন্দ

প্রথম পর্ব

একজন অনুরোধ করেছেন সাধু জীবনের প্রথম দুর্গা পূজা করার অভিজ্ঞতা বলতে। আমি আগে দেখার অভিজ্ঞতা বলি।

মঠের দুর্গা পূজা প্রথম দেখা বেলুড় মঠে ১৯৯৪ সালে। আমরা নবাগত তাই সবেতেই ব্রাত্য। ট্রেনিং সেন্টারের দাদারা আগমনী গাইছেন আমরা স্থানাভাবে রিহার্সাল রুমের বাইরে বসে শুনছি গুণগুণ করছি। বাইরে থেকে যতটা শোনা যায় তাই শুনছি। পূজারী ব্রহ্মচারী বিভূ মহারাজ (বর্তমানে আত্মলোকানন্দজী), তন্ত্রধারক স্বামী দিব্যানন্দজী। পূজা দেখতে ঠায় বসে থাকতেন স্বামী আত্মস্থানন্দজী, গীতানন্দজী, প্রমেয়ানন্দজী, ভজনানন্দজী, শিবময়ানন্দজী মহারাজেরা। পরম পূজনীয় ভূতেশানন্দজী সকাল বিকেল আসতেন, থাকতেন অনেক্ষণ। একটা জমাটবাঁধা ভাব তৈরী হত। পূজনীয় রমেশ মহারাজ ও বিপ্রদাস মহারাজ সবাইকে নিয়ে গাইতেন।

আমরা জুলজুল করে তাকিয়ে থাকতাম বেড়ার অন্য পাড়ে। মাকে হাওয়া করা হত। হাত নিশপিশ করত, কিন্তু সুযোগ মিলত না। অষ্টমীর দিন বিকেলে সবাই ক্লান্ত। গরমও ছিল বেশ। সেদিন মায়ের দীন সন্তানদের ডাকা হল মাকে হাওয়া করতে। ফুলের মালা পরাতে গিয়ে প্রতিমার সামনের কয়েকটা চুল খুলে গেছে। আমাদের মনে হল মা যেন সারাদিনের পূজায় ক্লান্ত। আমরা প্রাণ ভরে তালপাতার বড় পাখা দিয়ে হাওয়া করতে থাকলাম মায়ের ক্লান্তি দূর করার জন্য। এর মধ্যে মাখন মহারাজ মইয়ে উঠে মায়ের চুলগুলি ঠিক করে দিলেন। মায়ের মূর্তি আবার সতেজ হয়ে উঠল। আমরা বোকা বালকের দল হাসতে হাসতে মনে এই আনন্দ নিয়ে নিজ নিজ আবাসে ফিরলাম, যে, আমাদের সেবায়

মায়ের ক্লান্তি দূর হয়েছে। মায়ার কি প্রভাব, যাঁর স্নেহ কোল আমরা খুঁজি সতেজ হব বলে তাঁরই কিনা আবার ক্লান্তি দূর করতে চলেছি!! মা-ও তাঁর ছেলেদের এই ছেলেমানুষী দেখে প্রশ্রয়ের হাসি হাসছিলেন। আমরাও আনন্দ করে আমাদের সাধু জীবনের প্রথম পূজা কাটাচ্ছিলাম। অষ্টমীর দিন নতুন ধুতি উত্তরীয় পরে মায়ের সামনে ক্যাট-ওয়াক করলুম, মা ঠোঁট টিপে হেসে সেটা প্রত্যক্ষ করলেন। জীবন সায়াহ্নে এসে সে কথা ভেবে এক স্বর্গীয় আনন্দ হচ্ছে।

পর্ব দুই

পরের বছর ১৯৯৫ সালে দুর্গা পূজার সময় আমি আছি বেলঘরিয়া স্টুডেন্টস হোমে। কালী পূজা, সরস্বতী পূজা, বিদ্যার্থী ব্রত হোমের অনুষ্ঠান আর রাজা মহারাজের উৎসব - এই চার উৎসব ভিন্ন সারা বছর আশ্রমিকরা পড়াশুনায় মেতে থাকে। বাইরের পৃথিবীর নানা রঙ ছাড়াই জীবন রঙিন। কেবল সপ্তমী থেকে নবমী অবধি শ্রীশ্রীদেবী মাহাত্ম্য পাঠ চলত। শিবনারায়ণদা পাঠ করতেন। দাদা এত নিখুঁত ভাবে পড়তেন যে কখনও কখনও পাঠ বড় যন্ত্রবৎ বলে প্রতীত হত।

পূজার দিনগুলি খুব ভোরে রহড়া আশ্রম থেকে একদল স্বেচ্ছাসেবক, আশ্রমের দুর্গা পূজার জন্য ফুল বেলপাতা তুলতে আসতেন। নিমেষের মধ্যে আশ্রমের সব ফুল গাছ ফাঁকা হয়ে যেত। আশ্রমের জন্য ফুল আমরা আগের দিন কুঁড়ি অবস্থায় তুলে রাখতাম।

আমাকে মঠে পূজা দেখতে দেওয়া হল, মহাষষ্ঠীর সন্ধ্যা থেকে মহাসপ্তমীর সকালে মহাস্নান দেখে ফিরে আসতে হবে এই শর্তে। আত্মস্থানন্দজী তখন সাধারণ সম্পাদক। মঠে পৌঁছে সবাইকে প্রণাম করে মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। মহারাজ অফিসের সামনে তখন হাঁটছিলেন। আমার পূজা দেখার সময়সীমা শুনে জিজ্ঞাসা করলেন "কলেজ তো বন্ধ তোর তাহলে কি কাজ?" তারপর হেসে বললেন, "বুঝলি তো যেটুকু সুযোগ পেয়েছিস, প্রাণভরে গ্রহন করবি, দেখবি খুব আনন্দ পাবি।"

সন্ধারতির পর বোধন, আমন্ত্রণ, অধিবাস হচ্ছিল মন্দিরের এক কোণে। পূজনীয় আত্মস্থানন্দজি একটা আসন পেতে সারা গায়ে উত্তরীয় জড়িয়ে বসে একটানা জপ করছিলেন। মনে হচ্ছিল পাথরের মূর্তি। অস্থায়ী বাল্ব-এর আলোয় ওনাকে খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। মায়ের বিশেষপূজা বিল্ববৃক্ষের পূজা হতে থাকল। মায়ের আরতি হবার পর নবপত্রিকার অধিবাস হতে থাকল। পূজনীয় দিব্যানন্দ মহারাজের সেই উদাত্ত কণ্ঠের মন্ত্রচ্চারণ আজও কানে বাজে। পরের দিন মহাস্নান দেখে ফেরবার জন্য মন্দির থেকে বেরোচ্ছি দেখলাম বেলঘরিয়ার গাড়ীর সারথি রামদা বললেন, অমলানন্দজী এসেছেন, উনি প্রসাদ পেয়ে ফিরবেন আমিও যেন তাঁর সঙ্গে ফিরি।

আমিও সারা সকাল পূজা দেখলাম। তখন হুজুগে ভক্তদের সংখ্যা কম ছিল, তাই মন্দির ফাঁকাই। একদিকে গান হচ্ছে, অন্যদিকে মন্ত্রচ্চারণ চলেছে উদাত্ত গলায়। নদীর অবিরাম ধারার মত একদল পূজার জোগাড় দিয়ে চলেছে। একটা আবেশের মত চলল বেশ অনেকক্ষণ। প্রসাদ পেয়ে মহারাজের সঙ্গে ফিরলাম। শুনলাম আত্মস্থানন্দজীর কাছে আগের দিন রাতে ফোনে আমার কারণে খুব বকুনি খেয়েছেন। আমি আজও মনে মনে সেই বকুনি খাবার দৃশ্যটি কল্পনা করি। আত্মস্থানন্দজী মণ্ডপে দেবীর সকালের পূজা দেখে অঞ্জলী দিয়ে ফিরে গেলেন। দীর্ঘ সময় জপ করে যখন উঠলেন গভীর থমথমে মুখ তাঁর।

নবমীর দিন রহড়া বালকাশ্রমে যাওয়া হল প্রতিমা দর্শনে ও প্রসাদ পেতে। সে বছর ওই ভাবেই পূজা শেষ হল। পূজনীয় একব্রতানন্দজী প্রতিদিন ভোরে মন্দিরে মায়ের গান গাইতেন, আমরাও গলা মেলাতাম তাঁর সঙ্গে আর গুণ গুণ করতাম সারাদিন। মনে হত মাতৃ নাম সারা গায়ে মেখে পাখির মত মাতৃ আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছি আর মা আনন্দের স্মিত হাসি দিয়ে আমাকে লক্ষ্য করছেন।

পর্ব তিন

১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাস নাগাদ প্রথম পূজার আমন্ত্রণ এল। পূজনীয় অমলানন্দজী সেটি বাতিল করলেন। আবার জামশেদপুর থেকে আমন্ত্রণ আসায় পূজনীয় সরোজ মহারাজ যাবেন ঠিক হল। আমার মন খারাপ ভেবে মহারাজজী একদিন বোঝালেন "এই যে শিব জ্ঞানে জীব সেবা করছ এতে কি তোমার মন ভরছে না? তাহলে এই আনুষ্ঠানিক পূজা করতে কেন চাইছ?" পূজনীয় মহারাজ যে পূজা অনুষ্ঠানের বিরোধী ছিলেন তেমন নয় কিন্তু উনি বেশী ভরসা রাখতেন কর্ম সাধনা ও পড়াশুনার ওপর। একেবারে আড়ম্বর শূন্য একজন মানুষ, চেহারায় পোষাকে ছিলেন পরিপাটহীন কিন্তু মানুষটি ছিলেন "সোনার মত খাঁটি"।

অবশেষে এবার আমন্ত্রণ এল রামকৃষ্ণ মঠ, বারাসাত থেকে। পূজার আর মাত্র দেড় মাস বাকি। পূজারী যিনি হবেন ঠিক ছিলেন তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়েছে। অতএব আমায় যেন ছাড়া হয়। মহারাজজী রাজী হলেন কিন্তু প্রস্তুতি নেবার কোন আলাদা সময় দেবেন না বললেন। তন্ত্রধারক পূজনীয় অচ্যুতানন্দজী। প্রথম দিন শিখতে গিয়েই বুঝলাম উনি নিজে খুব ভালো পূজারী কিন্তু ভাল শিক্ষক নন। আমাদের আশ্রমের সরোজ মহারাজ, পূজা শিখতে দিব্যানন্দ মহারাজের কাছে যেতেন। পূজনীয় মহারাজকে জানাতে উনি একটি উপায় বললেন। উনি সরোজ মহারাজকে শেখাতেন আর আমি শিখতাম সরোজ মহারাজের কাছে। একলব্যের সাধনা শুরু হল।

তখন কলেজে মাস্টারমশাইদের ও অন্যান্য কর্মীদের চেকে মাইনে দেওয়া হত। ক্যাশিয়ারবাবুর কাজ ছিল চেক লেখা। প্রতি মাসে ওই সময় তাঁর ধুম জ্বর হত আর আমাকেই এই কাজটা সারতে হত। যেদিন মাইনে হত সেদিন তিনি আরোগ্য লাভ করে কলেজে আসতেন। পূজার আগেও সেই একই জিনিষ হল। বোনাস ও মাইনের চেক লেখার আগে ধুম জ্বর ওনার। যেদিন যাবো বারাসত সেদিন সকালে বসেও লিখে চলেছি চেক। মাথা কামানো হয়ে গেছে কিন্তু তখনও চেক লিখে চলেছি। সব শেষ করে ব্যাগ নিয়ে মহারাজদের প্রণাম করে চললাম বাস স্ট্যান্ডে বাস ধরব বলে। পথে দেখা হল আরোগ্য প্রাপ্ত ক্যাশিয়ার বাবুর সাথে। আমি আর তাঁর গল্প না শুনে পথ চলা শুরু করলাম।

পর্ব চার

বাসস্ট্যান্ডে এসে DN 2 বাসের জন্য দাঁড়িয়ে। বাস আসতেই উঠে পড়ে কন্ডাক্টর দাদাকে বারাসত মঠ এলে নামিয়ে দিতে বলেছি। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন তাই নামতে হলো চাঁপা ডালি মোড়ে। পায়ে হেঁটে ফিরছি আর ভাবছি, সবাই কত সহজভাবে মায়ের পূজাতে যাচ্ছে আমারটা এমন জটিল হচ্ছে কেন? আজ বুঝি জগন্মাতা আমাকে এই জটিলতার মধ্যে ফেলে আরো প্রার্থনায় ডুবিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

আমার কাছে কোন খাতা ছিল না। আলোক মহারাজ খাতা দিয়েছিলেন কিন্তু দিন কুড়ি পর সেই খাতা ফেরত নেন। বেলঘরিয়া অনেক সরস্বতী পূজার কার্ড ছাপা হত তার পিছন দিকটা সাদাই থাকত। আমি তাতে যতটা সম্ভব মন্ত্র লিখে নিয়েছিলাম। পকেটে করে নিয়ে যেতাম অফিসে, অবসরে মুখস্থ করতাম। দড়ি দিয়ে বাঁধা সেই কার্ডের বান্ডিল দেখে আলোক মহারাজ খুব ক্ষুব্ধ হলেন, বললেন, "আমি মঠে গিয়ে সত্যকৃষ্ণ মহারাজকে বলব তাঁর প্রিয় ব্রহ্মচারী মায়ের সাথে তাস খেলবে বলে এসেছে, দুর্গা পূজা করতে নয়।"

সেদিন ছিল বোধন কারণ পঞ্চমীর সন্ধ্যায় ষষ্ঠী পড়ে গেছে। তখন পূজা হত লাইব্রেরি হলে। হলের দুদিকের দুটি ঘর ব্যবহৃত হত পূজার কাজে। অধ্যক্ষ মহারাজের ঘরের চেয়ার টেবিল সরিয়ে হত ফলের ভাণ্ডার আর অন্যদিকে পূজা ভাণ্ডার। মাঝের অংশে মা বসতেন। কল্পারম্ভ ও বোধন ঘট বসত ঠাকুরের মন্দিরের মধ্যে পঞ্চমুন্ডির আসনের পাশে। পূজার কটা দিন ওখানেই শ্রীশ্রীদেবী মাহাত্ম্য পাঠ হত। বোধন পূজা শেষ হলে স্বস্তি হল। কেন আনন্দ হচ্ছে জানি না কিন্তু খুব আনন্দ হচ্ছে। তখন মঠে কৃষ্ণনগর থেকে প্রতিমা শিল্পী আসতেন। কি সুন্দর প্রতিমা হত। মনে হত এক্ষুনি কোন ছোট বাচ্চা এসে খেলার সাথী হিসেবে মাকে নিয়ে চলে যাবেন। বিরাট মায়ের বালিকা মূর্তি। বোধন শেষ করে ঘরে ফেরা - সঙ্গে আলোক মহারাজের বকুনি - কি কি ভুল হয়েছে তার বিস্তারিত আলোচনা। হবিশ্যান্ন খাবার সময়ও চলল সেই আলোচনা। পরের দিন কল্পারম্ভ। সময় খুব কম। তাই দ্রুত করতে হবে পূজা। ঘরে ফিরে আমি আবার আমার তাসের পাতা খুলে বসলাম। পড়তে পড়তে ধ্যান মন্ত্রে মায়ের ছবিটি ভাবতে ভাবতে ঘুমোতে গেলাম।

পর্ব পাঁচ

বেলুড় মঠের পূজনীয় আত্মস্থানন্দজী ও বেলঘরিয়ার পূজনীয় অমলানন্দজী দুজনেই ছিলেন পারফেকশনিস্ট। তাই আমার মত বোকা অকাজের ধারীকে সোজা করতে ওদের সব সময় বকাঝকা করতেই হত। আমি তাতে কতটা সোজা হয়েছিলাম জানিনা কিন্তু বকাঝকা প্রুফ হয়ে গিয়েছিলাম। তাই আলোক মহারাজের বাক্যাগ্নি আমার ওপর তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। তিথির স্বল্প স্থিতির জন্য দ্রুত পূজা করতে হচ্ছে। নবপত্রিকার স্নান ও দেবীর স্নান সেরে, অন্য পূজা সেরে, দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর দেবীকে একেবারে জীবন্ত মনে হচ্ছিল। চোখ তুলে ওপরে তাকাতেই মনে হল মা আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। স্মিত বরাভয়া দৃষ্টি দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। ঝড়ের গতিতে পূজা হচ্ছে। সঙ্গে ঝড়ের গতিতে অগ্নিময় বকুনি ভেসে আসছে তন্ত্রধারক মহারাজের দিব্য কন্ঠ থেকে। হঠাৎই হিমালয়ের মত স্তব্ধতা। মন্ত্রের বাইরে একটাও অগ্নিপাত নেই, হল কি জাদু? পূজা করতে করতে দেখলাম পূজনীয় গহনানন্দজী এসেছেন পূজা দেখতে। তাঁর উপস্থিতির কারণে সব বকুনি থেমে গেছে। মহারাজজী ধীর পদে মাকে প্রণাম করলেন, অর্ঘ্য দিলেন তারপর চেয়ারে বসলেন। আমি মহারাজকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু তাঁর উপস্থিতিতে সব শান্ত হয়ে গেল সেটা অন্তরে অনুভব করছিলাম।পূজা, ভোগারতি শেষ করে মহারাজজীর কাছে নিয়ে যাওয়া হল। গহনানন্দজী জিজ্ঞাসা করলেন, "মাকে কি বললে"? বললাম, "আমার পূজা নাও মা"। সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করে দিলেন, "আমার নয়, বল আমাদের।"

মুহূর্তের মধ্যে মনের ভাবটাই বদলে গেল। তাই তো- এই পূজা তো কেবল আমার নয় আমাদের। একটা সংশোধন কত বদলই না করে দেয়। আজও সেই শব্দ আমার কানে বাজে, "আমার নয়, বল আমাদের"।

পর্ব ছয়

তিথি আর পূজা বিধির সাথে দৌড়াতে দৌড়াতে সম্বিৎ ফিরে এল নবমীর সকালে। সকাল বেলা ৮.৩০ র মধ্যে হোম শেষ করে দশমীর পূজা শুরু হল। বারাসাতের ভক্তেরা বড় আশ্রমমুখী। সকাল থেকে রাত অবধি মুখটি বন্ধ করে হয় আশ্রমের কাজ করছেন না হলে পূজা দেখছেন। ফল ভাণ্ডার আর নৈবেদ্য তৈরির প্রধান ছিলেন তমালদা। মুখে একটাও কথা নেই, নি:শব্দে কাজ করে চলেছেন। দ্রুত অথচ নিখুঁত ভাবে নৈবেদ্য সাজাতেন। ওখানে তখন সপার্ষদ দেবীর ভোগ একটি, একটি শিবের আর একটি নারায়ণের। তমালদা ভেলকি দেখাতেন মিষ্টির থালা দিয়ে। খুব যত্ন করে মিষ্টি সাজাতেন। একবার এক থালা সীতাভোগ চুড় করে দেওয়া হল। ছুরি দিয়ে সেই সীতাভোগের পেটের মধ্যে রাস্তা বানানো হল। চেরী ফল আধখানা করে কেটে ভেজানো কিশমিশ আর কাজু দিয়ে সাজালেন। চূড়ায় দিলেন একটা বেলপাতা। বাটা চিনির নৈবেদ্য ও ওইরকম সাজিয়ে দেওয়া হত। দেবীর সামনে রাখা হলে নিবেদিত নৈবেদ্যর খুব শোভা হত। এর সঙ্গে দেওয়া হত বারাসতের বিখ্যাত লাংচা।
পূজান্তে একাদশীর দিন সকালে মহেশানন্দজীর সাথে বেলুড় মঠে যাওয়া হল। পূজনীয় ভূতেশানন্দজী জিজ্ঞাসা করলেন, পূজা করে আনন্দ পেয়েছি কিনা। পেয়েছি বলতে বললেন ওই আনন্দের জাবর কেটে যেতে।
বেলঘরিয়ায় ফিরলাম। সরোজ মহারাজও ফিরে এসেছেন। ওনার থেকে খাতা Xerox করে তৈরী হল দুর্গা পূজার নতুন খাতা। আর মায়ের সঙ্গে তাস খেলতে হবে না।

পর্ব সাত

পরের বারের অর্থাৎ ১৯৯৭ সালের পূজা করার বায়না এল অনেক আগেই, ১৯৯৬ সালের ২৪শে ডিসেম্বর। পূজনীয় মহেশানন্দজী এসেছিলেন বেলঘরিয়ায় রাজা মহারাজের উৎসবে। এসে আমাকে তো বললেনই আবার অনুমতি নিলেন পূজনীয় অমলানন্দজীর। খানিকটা নিমরাজী হয়ে মহারাজ রাজী হলেন। যেহেতু এক বছরের বেশী সময় আছে তাই ধীরে ধীরে শুরু করলাম। পূজনীয় সরোজ মহারাজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মন্ত্রের উচ্চারণ শেখালেন। সেগুলি রপ্ত করে মুখস্থ শুরু হল শুভ অক্ষয় তৃতীয়া তিথির দিন থেকে। তারপর প্রতি বছর আমি পূজার প্রস্তুতি শুরু করতাম অক্ষয় তৃতীয়া তিথি থেকে। বেশ চলছিল সব কিছু। হঠাৎই বেলুড় মঠ থেকে নির্দেশ এল ১লা সেপ্টেম্বর আমাকে যেন বেলুড় মঠে ফেরত পাঠানো হয়। নতুন কেন্দ্রে পাঠানো হবে। অমলানন্দজীর খুব মন খারাপ কিন্তু মুখে বলছেন, "দেখো, মঠের নির্দেশ আমাদের সব সময় মানতে হবে। আমি শুধু ভাবছি তোমার পূজার কি হবে?"
মঠে এলাম ১লা সেপ্টেম্বর আর ২রা সেপ্টেম্বর বলা হল আমাকে যেতে হবে রামকৃষ্ণ মঠ বারাসতে। তবে কথা এখন গোপন রাখতে হবে। পূজনীয় সাধারণ সম্পাদক মহারাজ বললেন, "তুমি কাল থেকে

মঠের ভাণ্ডারে কিছু কাজ করবে আর বাকি সময় শুধু পূজার প্রস্তুতি নেবে।" পূজনীয় সুব্রত মহারাজ, বর্তমানে প্রয়াত ও তখন ট্রেনিং সেন্টারের অন্যতম আচার্য্য এবারের পূজার তন্ত্রধারক। সাধক, প্রেমিক, পণ্ডিত আর দরদী। আমিও পরবর্তীতে ওনার ছাত্র ছিলাম। ওনার সঙ্গে দেখা হতেই বললেন, "কোন কোন অংশ ভাল করে মুখস্থ হয়নি।" সেই অংশগুলি বলতেই ওনার খাতায় পেন দিয়ে মার্ক করে রাখলেন। পূজার সময় ওই মন্ত্রগুলি বলার সময় টেনে টেনে বলতে থাকলেন যাতে আমি শুনে শুনে বলতে পারি। কাউকে জানতে দিলেন না আমার খামতিগুলো অথচ সব মন্ত্র পড়লেন। অবশেষে ২১ তারিখ নতুন অধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী ধর্মদানন্দজীর সঙ্গে যাত্রা করলাম রামকৃষ্ণ মঠ, বারাসত। ধর্মদানন্দজী বারাসত আশ্রমে পৌঁছেই আমাকে ২৩ তারিখ থেকে ঠাকুর পূজায় লাগিয়ে দিলেন, বললেন, পূজা করলে পূজার ক্রমগুলি সহজ হবে। আসল পূজা করতে পারব confidently। এমনকি মহালয়ার ঠাকুরের বিশেষ পূজা করালেন যাতে দুর্গা পূজার সময় আমার জড়তা কাটে। বেশী করে জপ ধ্যান করতে বলতেন যাতে পূজার ভাব মনের মধ্যে গেঁথে যায়। শুরু হয়ে গেল আরেক পূজার প্রস্তুতি।

পর্ব আট

পূজনীয় সুব্রত মহারাজ এলেন চতুর্থীর সন্ধ্যায় সঙ্গে নতুন ঠাকুরের পূজারী। আনন্দময় মানুষ ছিলেন পূজনীয় সুব্রত মহারাজ। এসেই সব স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে বসলেন কিভাবে তিনি পূজাটি করাতে চান সে বিষয়ে বললেন। রাতে বসলেন আমার সাথে, আমার কেমন প্রস্তুতি হয়েছে জানতে। ওনার কথা শুনে মনে হল উনি সন্তুষ্ট। নতুন পূজারী মহারাজ পরের দিন থেকেই ঠাকুরের পূজা আরম্ভ করলেন। কিন্তু সেই দিনই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বেলুড় মঠ থেকে নতুন পূজারী চাওয়া হল, কিন্তু সে অবধি আমাকেই পূজা চালাতে বলা হল। পূজনীয় সুব্রত মহারাজ বললেন, "ভালই হল, তুমি আরেকটু অভ্যাস করার সুযোগ পেলে"। মায়ের পূজা করতে গিয়ে দেখলাম এটা সত্যিই কার্যকরী। চারদিন পূজা কাটলো মহানন্দে। নিত্য পূজা করার ফলে জড়তাও কেটে গেছে। তন্ত্রধারক মহারাজ পূজার ক্ষেত্রে খুব স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। সর্ব অবস্থায়। বকা ঝকা না করে খুব সাহায্য করলেন।সে বছর সপ্তমীর দিন এসেছিলেন পূজনীয় স্বামী গহনানন্দজী, নবমীর সকালে পূজনীয় স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী, বিকেলে পূজনীয় স্বামী স্মরণানন্দজী, স্বামী সুহিতানন্দজী ও স্বামী শ্রীকরানন্দজী। সবার উপস্থিতিতে খুব আনন্দে কাটল পূজা। রোজ সন্ধ্যাবেলায় গান হত। সুকণ্ঠী পূজনীয় সুব্রত মহারাজ আমাদের সবাইকে নিয়ে গান গাইতেন। উনি এমন ভাব নিয়ে গাইতেন যেন মনে হয় প্রতিমাস্থ দেবতারাও আমাদের কাছে বসে গান শুনছেন। হর্ষে আনন্দে কাটল সে বছরের পূজা।

পর্ব নয়

১৯৯৮-১৯৯৯ কাটল বেলুড় মঠের ট্রেনিং সেন্টারে। অতএব পূজা থেকে ৭০০ মাইল দূরে নানা কাজেই কাটল পূজার দিন। ১৯৯৮ সালের পূজারী ব্রহ্মচারী সুকুমার আমার রুমমেট। পূজা করে ফিরে এসে কাপড় রেখে দিতেন। আমার কাজ ছিল তা ধুয়ে শুকিয়ে ইস্তিরি করার। বাকি সারাদিনে তিনবার সাধু পঙ্গতে পরিবেশন। খুব চেষ্টা করতাম, সকালে দ্রুত সার্ভিং শেষ করে মহা স্নান দেখার, কিন্তু একদিনও

হয়নি। তবে রোজ মায়ের বিশেষ পূজা দেখতে পেতাম। পূজার শেষ বড়রা অঞ্জলী দিতেন আমাদের ছোটদের হত পরে। সে সময় আমি আবার অন্য কাজে চলে যেতাম তাই ফুল বেলপাতা নিয়ে অঞ্জলী দেওয়া হত না। তাই বড়রা যখন মন্ত্র পড়তেন আমিও পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র পড়তাম। মনে হতো নাই বা থাকল ফুল বেলপাতা, আমি আমার মন্ত্র পুষ্পাঞ্জলি মায়ের পায়ে নিবেদন করছি। মা নিশ্চয় তা গ্রহন করবেন।

পূজার একমাস আগে থেকে আগে থেকে মঠে আগমনী ও কালী কীর্তন শেখানো হত। পূজনীয় রমেশ মহারাজ খুব যত্ন করে তা শেখাতেন। পঙ্গতে সার্ভিং-এ কারণে আমি শেষের দিকে থাকতে পারতাম না বলে রাগ করতেন। পূজার কটা দিন মহারাজের সাথে গাইতাম। বিশেষ করে মহালয়ার দিন উনি গাইতেন "যাও যাও গিরি অনিতে গৌরী আমার উমা নাকি বড় কেঁদেছে"। ওনার গান শুনলে মনে হত মহারাজ যেন সত্যিই উমার চোখের জল দেখেছেন। কিংবা নবমীর দিন সকালে গাইতেন "বলিস দুদিন থাকতে হেথা কালকে ভোলা নিতে এলে"। গান শুনে একটা ছবি ভেসে উঠত যেন মা গৌরী পালঙ্কে বসে পা দুলাচ্ছেন আর মা মেনকা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে দেবাদিদেবকে আটকানোর নানা ফন্দী শেখাচ্ছেন। কি অপূর্ব সেই গান। ছবির মত আমাদের সামনে ভেসে উঠত। আজ রমেশ মহারাজ রামকৃষ্ণলোকে - তেমন দরদ দিয়ে কেউ গায় না। গত বছর রিহার্সালের সময় আমি মঠে থাকায় একদিন গিয়েছিলাম। সবার অনুরোধে গাইলামও বটে কিন্তু ছবির মত হল না। কানে ভাসতে থাকল মহারাজের গাওয়া সব গান, গায়কের হৃদয়ের সব আবেগ অশ্রু হয়ে শ্রোতার হৃদয়কে সিক্ত করা গান।

পর্ব দশ

বেলুড় মঠে প্রশিক্ষণ শেষে আনুষ্ঠানিক ব্রহ্মচর্য দীক্ষন্তে পোস্টিং হল রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার গোল পার্কে। পূজনীয় স্বামী প্রভানন্দজী সম্পাদক। সেবারে পূজা করতে পাঠানো হল রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম - রহড়া। অধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী জয়ানন্দজী মহারাজ নিজে অত্যন্ত পণ্ডিত ও বহুবছর দুর্গা পূজা করেছেন। তন্ত্রধারক ছিলেন শ্রী বিধুভূষণ নন্দ - ছেলেরা যাঁকে বিবিএন নামেই একডাকে চেনেন। খুব পণ্ডিত মানুষ ও অসম্ভবনিষ্ঠা তাঁর। জুলাই মাস থেকে আমি প্রতি রবিবার গোল পার্ক থেকে রহড়া যেতাম পূজা অভ্যাস করতে। খুব যত্ন করতেন পূজনীয় জয়ানন্দজী।

চতুর্থীর দিন ওনারা নিয়ে গেলেন। সেদিন ও পরদিন চলল টানা প্রস্তুতি। ষষ্ঠীর দিন পূজা শুরু হল। বেলুড় মঠের মত প্রতিমা অথচ দেখতে একেবারে মানুষের মত। মন্দিরে পূজা হত। ওখানকার ঠাকুরের বিগ্রহ খুব সুন্দর। সন্ধ্যায় দেবীকে নানা স্বর্ণালঙ্কার দিয়ে সাজানো হল। রোজ পূজা শুরু হত সময় ধরে, শেষও তাই। পূজনীয় জয়ানন্দজী পূজারীর থেকে একটু দূরে বসে গোটা পূজার মন্ত্র পাঠ করতেন আর অন্যদিকে পূজনীয় বিমল মহারাজ দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করতেন। মনে হত এক মন্ত্রবলয়ের মধ্যে পূজা করছি। খুব আনন্দ হত। সারা সকাল গান, স্তব স্তুতি চলত।

নবমীর সন্ধ্যায় পূজনীয় জয়ানন্দজী সবাইকে নিয়ে বসে শ্রী শ্রী কালী কীর্তন করতেন। এখনও কানে ভাসে "নব সজল জলধর কায়" গানটি। বেলুড় মঠের পর এত সুন্দর প্রতিমা ও পূজা আর দেখিনি। মন্দির কানায়-কানায় ভর্তি কিন্তু একটা পিন পড়লেও যেন আওয়াজ হবে এমন নিস্তব্ধতা। সেই নিস্তব্ধতাকে কেটে ধ্বনিত হচ্ছে কেবল মন্ত্র স্তব আর স্তুতি, যার প্রতিধ্বনি আজও বেজে চলেছে মনে।

পর্ব এগারো

২০০১ সালে আমাকে পূজা করতে পাঠানো হল রামকৃষ্ণ মঠ, মেদিনীপুরে। সেই থেকে তিন বছর ওখানেই পূজা করেছি ও একাদিক্রমে এগারো বছর তন্ত্রধারকের কাজ করেছি। তবে তিন বছর তিনজন তন্ত্রধারকের কাছে পূজা করেছি। প্রথম বছর পূজনীয় প্রদ্যোৎ মহারাজ। ভীষণ সিরিয়াস কিন্তু মাত্র এক বছর পূজা করার পরেই তন্ত্রধারক হয়ে এলেন, ফলে প্রথম দুদিন খেই পেতেই দিশেহারা। এখন মেদিনীপুর মঠেযে দুর্গা দালানে পূজা হয়, আগে সেটা ছিল একটা স্টোর, দেখতে অনেকটাই বাস-গুমটির মত। সারা বছর নানা বাতিল জিনিস দিয়ে ভর্তি থাকত, কেবল দুর্গা পূজার সময় খোলা হত। ভীষণ মশা - তেঁনারা ষষ্ঠী ও সপ্তমী দুদিন আমাদের রক্তাত করে অবশেষে ক্ষান্ত হয়ে পড়তেন ধুপ ধুনার ধোঁয়ায়। অষ্টমীর সকাল থেকে ভীর হত খুব।

এখানে গিয়ে কয়েকটা নতুন জিনিস দেখলাম -

এক) এই আশ্রমের দীর্ঘ দিনের সম্পাদক পূজনীয় স্বামী বিশোকানন্দ মহারাজকে চিনতেন না এমন লোক সংযুক্ত মেদিনীপুরে ছিলেন না। আশ্রমের আর্থিক অবস্থার কথা চিন্তা করে তিনি বিভিন্ন পরিবারের কাছে উৎসবের জন্য ছোট ছোট জিনিস চাইতেন। কাউকে বলতেন তুমি তোমার সাধ্যমত মাকে একটা শাড়ী সিঁদুর আলতা আর অগুরু দেবে, কাউকে বলতেন তুমি শিব ঠাকুরের জন্য পাড় ছাড়া ধুতি উত্তরীয়, কাউকে বাতাসা, কাউকে ফল, কাউকে ধুপ, কাউকে হোমের ঘী, কাউকে বা ভোগের জন্য তেল মশলা দিতে বলতেন। যে মানুষকে মহারাজ অনুরোধ করেছিলেন তিনি তাঁর সমস্ত জীবন ধরে তাই দিয়ে গেছেন - এমনকি সেই ধারা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ধরে রেখেছেন তাঁর পরবর্তী প্রজন্ম। ফলে আশ্রমের অর্থ সম্পদ তেমন না থাকলেও উপচারের অভাব হত না। ভক্তেরা বাড়ী থেকে আসার সময় বাড়ীর গাছের ফুল দেবীর সেবায় দিতেন।

দুই) মেদিনীপুরের বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে সন্ন্যাসীরা চাঁদা চাইতে ও সবাইকে আমন্ত্রণ জানাতে যেতেন। সবাই আসতেন পূজার সময়। মেয়েরা যেমন বাপের বাড়ী আসে পূজার সময় তেমনি গ্রামের মেয়েরা মায়েরা তাঁদের সন্তান স্বামী নিয়ে বাক্স পত্র নিয়ে হাজির হতেন পঞ্চমীর সন্ধ্যায়। মেয়েরা থাকতেন হোস্টেল বাড়িতে ছেলেরা স্কুলে। সারাদিন এক সঙ্গে বসে পূজা আরতি দেখা হত। একাদশী থেকে এঁদের নিয়ে শুরু হত ভক্ত সম্মেলন। একাদশীর সন্ধ্যা থেকে ত্রয়োদশীর দুপুর অবধি। ফিরে যাবার সময় সবাইকে প্রসাদি নাড়ু লাড্ডু ও বোঁদে দেওয়া হত। দুই পক্ষই, আশ্রমের সাধুরা ও মায়েরা সজল নেত্রে বিদায় নিতেন নিজেদের ক্ষেত্রে। এই জিনিস কোথাও দেখিনি। শহরের ভক্তদের ভক্ত সম্মেলনে দেখতে দেখতে সয়ে যাওয়া আমাদের চোখের সামনে এই দরিদ্র অথচ আন্তরিক ভক্তেরা ছিলেন বসন্তের বাতাসের মত।

পর্ব বারো

প্রথমবার মেদিনীপুরে মঠে পূজা করতে এসেছি। সবাই নতুন তিনজন ছাড়া। ভান্ডারী মহারাজ পূজনীয় সুরপতি মহারাজ, নিমাইদা (পরে স্বামী নিজানন্দজী) আর ভক্তিপ্রসাদদের চিনি একটি রিলিফের সূত্র ধরে। আর চিনি পরম পূজনীয় ভূতেশানন্দজী মহারাজের সেবক - পূজনীয় শিখরেশ মহারাজকে। রূপসী বাংলা এক্সপ্রেসে মেদিনীপুর এলাম - পূজনীয় শিখরেশ মহারাজই আমাকে নিতে

এলেন। এসেই গাড়ি করে আশ্রমে। এসে দেখলাম, শুধু বাঁশ বাঁধা হয়েছে মণ্ডপের সামনে, বাসন মাজা শুরু হয়েছে একদিকে আর সেই গুমটির মত দুর্গাদালান থেকে অবাঞ্ছিত দ্রব্য বার করে দেবার প্রক্রিয়া সবে শুরু হয়েছে। অধ্যক্ষ স্বামী আত্মপ্রভানন্দজী অফিসের বাইরের বেঞ্চে বসে আছেন আর ভিতরের অফিসে অরুন মহারাজ। দোতলায় একটা ছোট্ট ঘরে থাকতে দেওয়া হল। অফিসে এসে ওখানকার বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দিরের চপ ও মুড়ি খাওয়া হল। খাওয়া শেষ করেই পূজনীয় প্রদ্যোত মহারাজ খাতা নিয়ে বসলেন আমার সাথে। কবে কোন পূজা পর পর হবে। চেয়ে পাঠালেন নৈবেদ্যর লিস্ট কিন্তু বর্ষীয়ান নৃপেণদা তখনও আসেননি তাই কিছুই পাওয়া গেল না। সন্ধ্যার দিকে মণ্ডপ বেশ পরিস্কার হয়েছে। এক কোণে কলারম্ভ, বোধন ঘট, বেলতলা হবে ঠিক হলেও টা তখনও বসানো হয়নি।

মেদিনীপুর মঠে তখন ব্রাহ্মণ স্বেচ্ছাসেবকদের চূড়ান্ত দাপট ছিল। অথচ এরা অনেকেই অসুস্থ - সময় মত আসতে পারতেন না। ফলে প্রতিদিনের পূজা খানিকটা ধীরে ধীরে শুরু হত আর গতি পেতে প্রায় সকাল আটটা হয়ে যেত। তবে এনাদের এত আন্তরিক ভাব যে সব খামতি মিটে যেত। খুব মনে পড়ে অনেককে। চান্দুদা তাদের মধ্যে অন্যতম। হৃদরোগে বার বার আক্রান্ত - কিন্তু ছোটাছুটি দেখে বোঝা যেত না। সকালে পরিষ্কার সাদা তাঁতের ধুতি গাছ কোমড় করে পরে, তার ওপরে সাদা স্যান্ডো গেঞ্জী পরে দীর্ঘদেহী দাদা যখন ঠাকুরকে প্রণাম করতেন তখন সে এক দর্শনীয় মুহূর্ত ছিল। সন্ধ্যারতির সময় ভাণ্ডার ঘরে নাচতেন, আর তাঁকে ঘিরে ছোট বড় মেজ সেজো স্বেচ্ছাসেবীরা। বিজযার দিন দাদা-ই মায়ের হয়ে কনকাঞ্জলী দিতেন। কাঁসাই নদীতে বিসর্জনের পথে তখন গান হত - পরে বন্ধ হয়ে যায়। দাদা সারা রাস্তা নাচতে নাচতে যেতেন আর গাইতেন। প্রতি বছর বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাতে এসে বলতেন, বুঝলেন মহারাজ, আগামী বছরে আর দেখা হচ্ছে না, এই শেষ। পরের বছর আবার দেখা হত।

একদিন সত্যি সত্যি রামকৃষ্ণলোকে রওনা দিলেন আর আমিও তখন পূজার জগত থেকে অনেক দূরে। এখনও বিজয়া এলে মনে মনে সেই সদা হাস্যোজ্জ্বল দীর্ঘদেহী দাদার নাচ দেখতে পাই সঙ্গে সেই প্রাণ মাতানো গান - ‘একবার বিরাজ মা হৃদি কমলাসনে’।

পর্ব তেরো

মহামায়ার কৃপায় আমি ছয় বছর শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা করার সুযোগ পেয়েছিলাম। ছয় বছরে ছয়জন তন্ত্রধারকের কাছে পূজা করার সুযোগ হয়। পূজার মূল কাঠামো সবারই এক - শুধু সেটাকে বাস্তবায়িত করার পদ্ধতি প্রত্যেকের আলাদা আলাদা। মেদিনীপুরে পর পর তিন বছর তিনজন তন্ত্রধারক। প্রথম বছর পূজনীয় প্রদ্যুৎ মহারাজ, দ্বিতীয় বছর পূজনীয় চন্দন মহারাজ আর শেষের বছর পূজনীয় জগন্নাথানন্দজী। পূজনীয় প্রদ্যুৎ মহারাজ খুব সিরিয়াস, পূজনীয় চন্দন মহারাজ ছিলেন খুব মুডি কিন্তু পূজনীয় জগন্নাথানন্দজী ছিলেন পণ্ডিত, সিরিয়াস আবার দরদী। এত যত্ন করে পূজা করাতেন মনে হত আমি যেন কাঁচে বাঁধানো পুতুল।

সেবারে হোমের কাঠ খুব শুকনো ছিল আর ওখানে হোম কুন্ডটি চারটি কাঠের পায়ার ওপর বসানো হত - তাই বেশ উঁচু - এরপরে খুব উঁচু করে কাঠ দিয়ে সাজানো হয়েছে। জগন্নাথানন্দজী মণ্ডপে এসে

ধীরে ধীরে হোম কুন্ডের কাছে এসে কাঠের সংখ্যা কমিয়ে দিলেন। আমায় বললেন, "এই কাঠে আগুন জ্বললে তার তাপে তোমার বসতে কষ্ট হবে। দরকার পড়লে আবার কাঠ দেওয়া যাবে"। এমন করে বললেন, মনে হল যেন উনি মনে মনে আগে থেকেই আমার কষ্টটি অনুভব করতে পারছিলেন। হোম শুরু হল, মায়ের নামে আহুতিও দেওয়া হল, আর সেই আগুনের স্নিগ্ধ শিখার মধ্যে জগন্মাতার স্নেহের পরশ অনুভব করছিলাম।

সন্ধি পূজা চলছে। নির্দিষ্ট সময়ে একটা গোটা পূজা শেষ করতে হবে। মহারাজ আগে এসেই দেখে নিলেন সব ব্যবস্থা ঠিক হয়েছে কিনা। নিজের পাশে একটি অতিরিক্ত ঘণ্টা নিলেন যাতে ঘণ্টা বাজানো নিয়ে কোন টেনশন না থাকে আমার। পূজার শেষে প্রতিটি পদ্ম ফুলের ডালি ধরে থাকলেন যাতে আমি দুহাত ভরে মাকে ফুল দিতে পারি। সব সাধু ও স্বেচ্ছাসেবকদের পদ্মফুল দিলেন যাতে সবাই মাকে অঞ্জলী দিতে পারি। নিজে দিলেন না একটাও, বললেন, "তোমাদের দেওয়ার মধ্যে কি আমার দেওয়া নেই?"

কুমারী পূজা হচ্ছে। পূজার শেষে মাকে ফল মিষ্টি দেওয়া হচ্ছে। জল দেবার সময় নিজে উঠে এলেন বললেন, "থুতনির নিচে তোমার বাম হাতটি পাতো, জল পড়লে মায়ের কাপড় ভিজবে না।" সত্যিই জল পড়ল কিন্তু সেই জল আমার বাম হাতেই পড়ল মায়ের গায়ে নয়। নরম গামছা দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিতে বললেন। পানের শেষের অংশ কেটে নিয়ে হাতে দিলেন, বললেন, "খাইয়ে দাও"। মনে হল মা দুর্গার জীবন্ত মূর্তির পূজা করাচ্ছেন।

পূজনীয় জগন্নথানন্দজী এখন রামকৃষ্ণ লোকে। এখন আমিও মায়ের আনুষ্ঠানিক পূজা করবার সুযোগ পাই না। কিন্তু প্রতি বছর যখন মনে মনে মায়ের পূজা করবার সময় এনাদের কথা মনে পড়ে আর তখন নিজের অন্তরে সে মহাপূজা করার আনন্দটি এখনও অনুভব করতে পারি।

পর্ব চোদ্দ

শ্রীশ্রীদুর্গা পূজায় মঠে অষ্টমীর দিন সকাল নয়টা নাগাদ কুমারী পূজা হয়। এক বছর বয়সী কুমারী কন্যা থেকে ১৬ বছর বয়সী কুমারীকে দেবী জ্ঞানে পূজা করা হয়। এই ধারা বেলুড় মঠ সহ রামকৃষ্ণ মঠের সব কেন্দ্রে যেখানেই প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা হয় সর্বত্রই অষ্টমীর দিন সকালে কুমারী পূজা হয়। আমি প্রতি বছর সাত বছরের কন্যাকেই কুমারী হিসাবে পেয়েছি যাঁর শাস্ত্রসম্মত নাম মালিনী কুমারী। কেবল মাত্র এক বছর পাঁচ বছর বয়সী একজনকে কুমারী কন্যা হিসাবে পাওয়া যায় যাঁর শাস্ত্রসম্মত নাম সুভগা কুমারী মা। ছোট মেয়ে একেবারে বিদেশী পুতুলের মত দেখতে কন্যা। বাবা মাও তাঁরই মত সুন্দর তবে শান্ত। কন্যাটির চোখগুলো অনেকটা পুতুলের মত। গোল গোল, মনে হচ্ছিল বিছানায় শুইয়ে দিলে অন্য পুতুলের মত চোখ বন্ধ করে দেবে।

কুমারীকে সাজানোর বিষয়ে আমার কতগুলি শর্ত থাকত। প্রথমতঃ মাথায় নকল চুল ও ওড়না লাগানো যাবে না। বাচ্চাদের যেমন বয় কাট চুল থাকে তেমনি সাধারণ ভাবে আঁচড়ানো থাকবে, মুখে মেক আপ থাকবে যত সামান্য। যতটুকু কল্কা না আঁকলে লোকে নিন্দা করবে ততটুকুই আঁকা হবে। দ্বিতীয়ত ফুলের দাদাকে বলে হাল্কা মুকুট আর মালা পরানো হয়। খুব হালকা বেনারসী ও অলঙ্কারের সঙ্গে পায়ে আলতা দেওয়া থাকবে। পুরো সাজাতে হবে আধ ঘণ্টার মধ্যে। এর বাইরে গেলেই আমরা

চেষ্টা করতাম অতিরিক্ত সাজ বাদ দিয়ে পূজা করতে। সকাল ঠিক পৌনে নটায় ঢাক ঢোল বাজিয়ে শুভাশীষ-এর কোলে চড়ে কুমারী মা আসতেন। সব মায়েরাই শান্ত থাকতেন। ভয় পেতে, কাঁদতে কাউকে দেখিনি বরং সংসার সর্বস্ব মানুষের মাঝখানে সংসার বৈরাগিনী এক যোগিনী বলেই মনে হতো। খুব দ্রুত পূজা হত। প্রথম বছর থেকে বলা হয়েছিল আরতি করবার সময় সংক্ষেপে প্রদীপ ঘোরাতে। অন্যেরা আগুনের সামনে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলেও এই পাঁচ বছরের কুমারী মাকে দেখলাম এক গাল হাসি নিয়ে বসে আছেন। যেন প্রতিটি উপাদান তিনি গ্রহন করছেন। আরতি পদ্ম ফুল হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিলেন যেন ওটা তাঁর চাই। আরতি ও স্তব পাঠ শেষ হলে প্রসন্ন দৃষ্টি দিয়ে দুহাত তুলে সবাইকে তাঁর বর ও অভয়া মুদ্রা প্রদর্শন করলেন। দর্শকদের মধ্যে তখন এক উত্তেজনা কুমারী মাকে একবার প্রণাম করার কিন্তু যাঁকে নিয়ে এত কান্ড তিনি কিন্তু শান্ত। আবার কোলে চড়ে মায়ের মূর্তির সামনে গেলেন, না বলতেই দুহাত জোড়া করে নত মস্তকে প্রণাম করলেন। যেন তাঁকে করা সব পূজার ফলটি দেবীর পায়ে নিবেদন করে নির্ভার হয়ে চললেন। আবার সেই কলকল খলখল বাচ্ছা মেয়ে রূপে প্রকাশিত হলেন। দুপুরে যখন বাড়ী ফিরে যাচ্ছিলেন কুমারী বাবা মায়ের সঙ্গে তখন বোঝার উপায় নেই যে তিনিই আজকের পূজিতা কুমারী। মনে হচ্ছিল ঝড়ের তাণ্ডবের পর শান্ত সমুদ্রের মত ধীর স্থির। এমন অভিজ্ঞতা আর কখনও হয়নি।

পর্ব পনেরো

দুর্গা পূজাকে কলি যুগের রাজসূয় যজ্ঞ বলা হয়। প্রচুর অনুষ্ঠান আর তাকে বাস্তবায়িত করতে চাই অনেক উপাচার ও মানুষ। বারাসত বা অন্যান্য জায়গায় সহযোগী মানুষের অভাব না হলেও মেদিনীপুরে এই স্বেচ্ছা সেবক সংখ্যা খুব কম ছিল। যাঁরা এতদিন পূজা পরিচালনা করে এসেছেন তাঁদের বয়স হচ্ছিল তাই প্রয়োজন ছিল নতুনদের আসা। এই বিষয়ে স্বামী আত্মপ্রভানন্দজীর একেবারেই কোন উৎসাহ ছিল না। এই অবস্থার পরিবর্তন হল যখন পূজনীয় স্বামী শ্রুতিসারানন্দজী অধ্যক্ষ হয়ে এলেন। ধীর স্থির স্বল্পভাষী নিষ্ঠাবান ও প্রতি জিনিসকে খুঁটিয়ে দেখার ক্ষমতা রাখতেন।
তখন পূজনীয় স্বামী সুনিষ্ঠানন্দজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি একদিন কয়েকটি বালককে এনে উপস্থিত করলেন পূজার স্বেচ্ছাসেবক হবার জন্য। রোহণ, সমীরণ, দন্তময়ী, দেবমাল্য, বাবলাদার ছেলে এদের। সঙ্গে ছিল ঋদ্ধি, আরেকজন রাইফেল শুটার। এদের নিয়ে শুরু হল আমাদের নতুন খেলা। এরা আমাকে ভয় পেত বেশী - ভালবাসত তার থেকেও বেশি। ভুল-ঠিক হতে হতে, অবশেষে নিখুঁত পূজার জোগাড় করে। এখন আর কেউ বালক নেই, সবাই স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। আমিও পূজা করিনা কিন্তু ওরা আজও মেদিনীপুর মঠের দুর্গা পূজার অন্যতম প্রধান অঙ্গ।
এই সেবকদের মধ্যে দুজন বাদ দিলে সবাই আব্রহ্মন। তাই বামুন দাদারা এদের ভোগের সময় থাকতে দিতেন না। আমি এক নতুন ফন্দি আটলাম। ভোগ সাজিয়ে দরজা বন্ধ করে বামুন দাদারা পাশের দরজার পাশে বসে থাকত। আর আরেকটি দরজার পাশে এদের আমি দাঁড় করিয়ে রাখতাম। ভোগ নিবেদন হয়ে গেলে মায়ের ব্রাহ্মণ নয় এমন ছেলেদের ভেতরে নিয়ে নিতাম। ওদের হাতে দিতাম দুটি বড় হাত পাখা আর তিনটি চামর। তাই দিয়ে ওরা মাকে হওয়া করত। নিজেরাই অদল বদল করে কাজ করত বাইরের কেউ জানতে পারত না। প্রথমবার লুকিয়ে ও পরের বার থেকে সকলের গোচরেই

এই কাজ করতাম। ধীরে ধীরে এই ছেলেরা তাদের ঐকান্তিক সেবা দিয়ে সবার মন জয় করে নিয়ে ছিল।

দর্পণ বিসর্জন হলে আমরা স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে প্রভু জগন্নাথজী, শীতলা মাতা আর মা কালিকে প্রণাম করে দুটো ঠাকুর দেখে ফিরতাম। নবমীর দিন হোম শেষ হলে সবাই একসঙ্গে আনন্দ করে প্রসাদ পেতাম। প্রসাদ খাওয়া হলে গ্রুপ ছবি হবেই। এই স্মৃতিগুলো বড় আনন্দের। জানি চিত্রপট বদলে গেছে, কিন্তু আমার মনে ওদের ওই ছোট মূর্তিগুলি স্থায়ী হয়ে গেছে।

পর্ব ষোল

শ্রী রামকৃষ্ণের ভাষায় প্রতিমায় দেবীর আবির্ভাব হয় তিনটি কারণে

১) প্রতিমা সুন্দর হওয়া চাই

২) পূজারীর ভক্তি

৩) গৃহস্বামীর আন্তরিকতায়।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন দ্বারা পরিচালিত সব পূজায় প্রথম দুটি ভাব সব সময় থাকে। কিন্তু গৃহস্বামীর আন্তরিকতা খুব দুর্লভ। তবে আমি যেখানে যেখানে পূজা করেছি সর্বত্র অধ্যক্ষদের পূজার বিষয়ে অতি মাত্রায় সচেতন দেখেছি যেমন বারাসত মঠে পূজনীয় মহেশানন্দজী, ধর্মদানন্দজী এবং পরে জয়ানন্দজী। কিন্তু মেদিনীপুর মঠের পূজনীয় শ্রুতিসারানন্দজীর মত কাউকে দেখিনি। উনি যেমন জাপক তেমনি পূজার বিষয়ে আগ্রহ কিন্তু সব কাজ করতেন নিঃশব্দে। ২০০৫ এ উনি এলেন মেদিনীপুর মঠের অধ্যক্ষ হয়ে। মহাস্নান থেকে একটানা পূজা দেখতেন মেঝেতে বসে। পূজার সাথেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন আমাদের করা পূজা।আমরা আগে মহাস্নানের সময় মাটির ছোট ছোট ঘড়া ব্যবহার করতাম। পরের বছর উনি সেই ধারা বদলে পিতলের ঘটি কিনে দিলেন। মাকে কুমোরটুলির অস্ত্র পরাতে আমাদের নাজেহাল অবস্থা দেখে পরের বছর প্রতিমার আকারের সঙ্গে মিল রেখে পিতলের অস্ত্র কিনে এনে দিলেন। পীতাম্বরীর ছোঁয়ায় সে অস্ত্র একেবারে সোনার অস্ত্র হয়ে উঠল। অস্ত্রগুলো জুড়ে জুড়ে পরাতে হয় - পূজা শেষ আবার খুলে রাখা যায়। বিসর্জনের সময় পিতলের অস্ত্র বদলে কুমোরটুলির অস্ত্র পরানো হত।

ওনার সঙ্গে পরামর্শ করে দেবীর সাজের কিছু বদল করা হয়। ফুলের দাদার সঙ্গে কথা বলে রজনীগন্ধার মালার সাথে গাঁদা ফুলের মালা আর অষ্টমীর দিন অপরাজিতা আর জবা ফুলের মালা পরানো হত। দেবীর গায়ে কোন স্বর্ণ অলঙ্কার ছিল না। মহারাজজী স্টোরে দেবীর একটি বড় রূপার হার, দেবী ত্রয়ীর পায়ের মল ও অনেক সোনার টিপ খুঁজে পেলেন। রূপার অলঙ্কারকে সোনার জলে পালিশ করা হল, সোনার টিপগুলিকে ভেঙ্গে তিনজনের জন্য তৈরি হল তিনটি টিকলি। স্বর্ণকার অলঙ্কার দেবার সময় দেবী লক্ষী, দেবী সরস্বতীকেও দুটি সোনার জল করা রূপার হার দিলেন। আমাদের মা ভিক্ষুকের স্ত্রী থেকে রাজেন্দ্রাণীতে রূপান্তরিত হলেন। আমরা দীন অভাজন মায়ের সেই দিব্য রূপ দেখে মুগ্ধ হতাম।

একবার সন্ধিপূজা পড়েছিল রাত একটার সময়। পূজা শেষ করে সব গুছিয়ে আমরা ঘরে এলাম রাত আড়াইটা নাগাদ। এসেই ধরাচুরা ছেড়ে ঘুম। সাড়ে ৩-টার সময় ঘুম ভাঙ্গল। বাইরে এসে দেখি অফিসে

বেঞ্চে বসে আছেন শ্রুতিসারানন্দজী। চুপ করে জপ করছিলেন। শরীর খারাপ হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করাতে বললেন, আর তো খানিক বাদেই মঙ্গলারতি হবে, তাই বসে আছি। একেবারে ঠাকুর ও মায়ের মঙ্গলারতি দেখে ঘরে যাবো। আমি ফিরে এলাম। পরের দিন সকালে মহাস্নানের সময় মণ্ডপে গিয়ে দেখি মহারাজজী স্নান সেরে এসে বসে আছেন। মুখে রাত জাগার ক্লান্তিটুকুও নেই। ওনার ভাব ছিল - মা এসেছেন আশ্রমে তাই সবটুকু সময় মায়ের সঙ্গে কাটাতে হবে। কাটাতেনও। এরই নাম গৃহস্বামীর আন্তরিকতা।

পর্ব সতেরো

দুর্গা পূজার অন্যতম অঙ্গ দেবীকে নিবেদিত ভোগ। বেলুড় মঠে দেখেছি দেবীকে খুব বিস্তারিত ভাবে ভোগ নিবেদন করা হয়। এছাড়াও ভাণ্ডারে দেবীর ছবির সামনে বিধিসম্মত ভাবে পূজা করে বিরাট ভোগ নিবেদন করা হয়। মন্দির থেকে দেবীর প্রসাদ নেমে এলে তাও মিশিয়ে দেওয়া হয় বিরাট ভোগের মধ্যে। এই ভাবে বিরাট ভোগের নিবেদন রীতি সব কেন্দ্রেই মানা হয়।

মেদিনীপুর মঠে দেবীকে ভোগ দেওয়া হত কল্পারম্ভের দুপুর থেকেই। দেবীর ও শ্রীশ্রীচণ্ডীর আমিষ ভোগ আর শিব ও নারায়ণের নিরামিষ ভোগ। ভাবটা এই - মা এসেছেন - সে তিনি বেল গাছেই থাকুন আর প্রতিমায় থাকুন, তাঁকে খেতে দিতেই হবে। গত বছর যাঁরা পূজা বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানী, তাঁরা পুঁথি পাঁজি দেখে, এই ষষ্ঠীর সকাল - রাত্রে ভোগ দেওয়ার প্রথাটিকে আশাস্ত্রীয় বলে ঘোষণা করে তা বন্ধ করে দেবার কথা ভাবছিলেন। দেবী এখন খান সপ্তমী থেকে নবমী অবধি। বিশোক মহারাজ সব দিনের জন্য অন্নভোগ প্রথা চালু করেছিলেন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে।

সে যাই হোক, খুব বিস্তারে ভোগ হয় দেবীর। শুধু দেবীরই নয়, ভোগ হয় লক্ষী, সরস্বতী, গনেশ, কার্তিক, নবপত্রিকাবাসিনী দুর্গা, শিব, নারায়ন, সিংহ, মহিষাসুরের। এত সুন্দর করে ভোগ দেওয়া হয় যে মনে হয় যেন সব দেবতারা বালক বালিকার রূপ ধারণ করে গুছিয়ে বসে গ্রহন করছেন। মা তাঁদের সঙ্গে নিয়ে বসেছেন। দুবেলা নানা সুস্বাদু নতুন নতুন তরকারী ও নতুন মিষ্টি দেওয়া হত। একবার দেবীর মিষ্টির সাজানো থালা ভোগের পাশে রাখতে গিয়ে দেখি থালা গরম। খবর নিয়ে জানা গেল দেবী খাবেন বলে মিষ্টির দোকান থেকে সদ্য বানানো লবঙ্গ লতিকা এসেছে।

আমরা পূজারীর দল এসব পেতাম না। পঞ্চমী থেকে অষ্টমী অবধি ফলাহার আর রাত্রে হবিষ্যান্ন। সে এক মিলন মেলা। আমাদের বালক স্বেচ্ছাসেবকরা দুপুরে মায়ের ভোগ খেত আর রাত্রে আমাদের সাথে। শ্রুতিসারানন্দজী আমাদের সঙ্গে দুবেলাই প্রসাদ পেতেন এবং বালকদের দুবেলার দুরকম খাবারের অনুমতিও দিয়েছিলেন। বালকরাও তাই আনন্দে মেতে মায়ের সেবায় জান প্রান লাগিয়ে পরিশ্রম করত। সকলের আনন্দে দেবীও তাঁর আনন্দময়ী রূপে প্রকাশিতা হতেন, যার পরশ লাগত সবখানে।

পর্ব আঠেরো

দুর্গা পূজার সময় বেলুড় মঠ ও অন্যান্য কেন্দ্রে যেখানে প্রতিমায় পূজা হয় সন্ধ্যরতির সময় পূজারী ব্রহ্মচারী ছাড়া আরো দুজন সন্ন্যাসী অবশ্যই মাকে আরতি করেন। সাধারণত এই সন্ন্যাসীরা তন্ত্রধারক

মহারাজ, ঠাকুরের পূজারী, অন্যান্য সাধুরাই করে থাকেন। কখনও কখনও কেউ কোন দিন আরতি করেননি এমন সাধুও সেই দলে থাকেন। মাঝে যিনি থাকেন তিনি আরতিটি পরিচালনা করেন। তাঁকে অনুসরণ করে বাকি দুইজন। মায়ের আরতি শেষ হলে শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দ্যেশ্য প্রদীপটি দেখিয়ে আবার ঘুরে যাওয়া হত। এই ঘোরার সময়ের টাইমিং নিয়ে প্রতিবার কিছু মজার ঘটনা ঘটত।
মেদিনীপুর মঠে একটি ঢাকি পরিবার থেকে প্রত্যেক বছর বাজাতে আসতেন। আমি যখন পূজা করি তখন বর্তমান ঢাকি ছোট ছেলে - দাদুর সাথে এসে কাঁশি বাজাত। ক্রমে সে-ই প্রধান বাজনদার হয়ে উঠল। সন্ধ্যার সময় হলুদ রঙে ছোপানো কাপড় পরে, মাথায় হলুদ ফেটটি বেঁধে আর ঢাকে পালক লাগিয়ে সারা মণ্ডপ ঘুরে নেচে নেচে সে বাজাত। অসাধারণ সেই বাজনা। আমি প্রতি বছর ওই ছেলেটিকে বলতাম, রোজ পূজার সময় সে যেন কোন একটা সময় কিছুক্ষণ মাকে বাজিয়ে শোনায়। আমার মনে হতো মা যেন প্রসন্ন হতেন সেই বাজনা শুনে। শেষ বছর দেখলাম তার দাদু মারা গেছেন, কাঁশি বাজাচ্ছে তার ছোট ছেলেটি, বাবা দ্বিতীয় বাজন্দার আর সে প্রধান বাজনদার।
গ্রাম থেকে একদল সানাই বাদক আসতেন। ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় এসেই বাজাতেন "জাগো দুর্গা জাগো দশ প্রহরণধরিণী"। ওরা এটি বাজালেই মনে হতো আশ্রম জুড়ে শরৎ কাল নেমেএসেছে। এক আনন্দের লহর বয়ে চলেছে সব খানে।

পর্ব উনিশ

প্রথম বছর যখন পূজা শিখতে যাই তখন পূজনীয় অচ্যুতানন্দজী পরম পূজনীয় স্বামী ওঙ্কারানন্দজীর একটি কথা আমাদের বলেছিলেন। কথাটা হল এই "মা আমাদের বিধিময়ী, মা আমাদের তিথিময়ী, মা আমাদের ভাবময়ী"। পূজা করবার সময় এই ভাবটি যেন মনের মধ্যে আমাদের থাকে। ঠিক তিথিতে শুধু পূজা শুরু করা নয়, ঠিক তিথিতে পূজা শেষও করতে হবে। তিথির স্বল্প স্থিতির কারণে পূজা সংক্ষিপ্ত করলে চলবে না। আবার বিধি ও তিথি দেখতে গিয়ে হৈচৈ করে পূজার ভাবটিকে নষ্ট করাও যাবে না। আমি সারা জীবন এই কথাটি মেনে চলেছি ও আজও তা মেনে চলবার চেষ্টা করি।
আমার পূজা করার ছয় বছরে যেমন প্রতি বছরের হিসাবে ছয় জন তন্ত্রধারক ছিলেন তেমনি দীর্ঘ ১২ বছরের তন্ত্রধারকের জীবনে ৫-জন পূজারীর সঙ্গে পূজা করার সৌভাগ্যহয়েছে। এছাড়া রাঁচি সনাটোরিয়ামে ১০ বছর শ্রীশ্রী জগদ্ধাত্রী পূজার তন্ত্রধারক হিসাবে পূজনীয় চিন্ময় মহারাজের সঙ্গে পূজা করার সুযোগ হয়েছে। শ্রীভগবানের কৃপায় যাঁদের সঙ্গে পূজা করেছি তাঁরা প্রত্যেকেই খুব ভালো পূজারী ছিলেন কিন্তু দুজন পূজারীর কথা আমি কোনদিন ভুলতে পারব না।
জগদ্ধাত্রী পূজার সময় পূজনীয় চিন্ময় মহারাজ পূজা করতেন। পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। যে শান্ত ভাব নিয়ে বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাণ্ড বাড়িগুলি, বেলুড় মঠের অভেদানন্দ কনভেনশন সেন্টার বানিয়েছেন সেই একই দক্ষতা দিয়ে তিনি পূজা করতেন। দশ মিনিটের দুটি ব্রেক দিয়ে তিনি অক্লান্তভাবে একটানা বারো ঘণ্টা পূজা করতেন -দেখে বোঝা যেত না। শান্ত, ধীর, প্রত্যয়ী ভঙ্গীতে পূজা করতেন যা দেখতে দেখতে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসত।
দুর্গা পূজায় যাঁদের পেয়েছি তাঁদের মধ্যে সেরা বলে বোধ হয়েছিল পূজনীয় স্বামী চন্দ্রকান্তানন্দজী। তিনি বর্তমানে পূজনীয় স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজের প্রধান সেবক। মন্ত্র যে একেবারে খুব দারুণ মুখস্থ হয়েছিল তা নয় এবং সে বিষয়ে সাহায্য করবার জন্য আমরা ছিলামই তবে তাঁর পূজার ভাবটি

ছিল অপূর্ব। ধীর-স্থির শান্ত ভাবে পূজা করছিলেন। কোন দেখনদারি ভাব নেই - একটা অদ্ভুত শরনাগতির ভাব ছিল। হোমের সময় আমাদের ভুলে ঘী বেশী গরম হয়ে গিয়েছিল। হোম শেষ হতে দেখা গেল মহারাজের ডান হাতের নিচে দুটো বড় ফোস্কা পরে গেছে। অথচ ওনার মুখে যন্ত্রণার বিন্দুমাত্র প্রকাশ নেই। আজও সেই কালো দাগটা দেখলে আমি কষ্ট পাই।

পূজনীয় চন্দ্রকান্তানন্দজীর সাথে একবার বাগআঁচড়া আশ্রমে শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণা পূজা করতে গিয়েছিলাম। পূজার কদিন আগে সেই আশ্রমে খুব বড় ডাকাতি হয়। তাতে আশ্রমের ঠাকুরের পূজার বাসন ছাড়া সব চলে যায়। দেবী পূজার বাসন যতটুকু না কিনলে নয় ততটুকুই কেনা হল। মহারাজ পূজারী আমি তন্ত্রধারক। সাধারণ আটপৌরে ফুল দিয়ে পূজা হচ্ছে। দেবীর বিশেষ পূজার জন্য ভাল একটা ছোট মালা এলেও দেবীর গলার মালা নেই। উৎপল মহারাজ গ্রামের মেয়েদের দিয়ে জবা ফুল দিয়ে এক বিরাট মালা গাঁথিয়ে দিলেন। সেই সামান্য মালা দেবী পড়লেন। চন্দ্রকান্তানন্দজী সেই মালা নিবেদন করলেন এবং সেই মালা পরানো হল। সন্ধ্যারতির পরেও সে মালা তেমনি সতেজ রয়েছেন। পূজা দেখতে কাশী থেকে আনন্দ মহারাজ এসেছিলেন - বললেন, "দেখো, দেবীর শ্রী অঙ্গের স্পর্শে তোমাদের দেওয়া এই জবার মালা কেমন দিব্য মালায় রূপান্তরিত হয়েছে"। একটা পাখা, ভাড়া করা তক্তপোষ আর প্রাণান্তকর গরম কিন্তু চন্দ্রকান্তানন্দজী শান্ত হয়ে পূজা করছেন। দেবীকে নিবেদনের জন্য খুব সাধারণ শাড়ী তাঁর আন্তরিকতায় অসাধারন কিছুতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই ঘটনা আজও আমার মননে আসে আর কানে ভাসে সেই কথা, "মনে রাখবে - মা আমাদের ভাবময়ী"।

পর্ব কুড়ি

এক বছর ঠিক দুর্গা পূজার আগে আমাকে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হল। সামান্য একটা সমস্যা দেখাতে গিয়ে ১৩ দিন হাসপাতাল বাস হয়ে গেল। এদিকে বাতাসে দুর্গা পূজার গন্ধ পাচ্ছি কিন্তু কেমন একটা সন্দেহ মনে জাগছে, মা বোধ হয় এবার আর আমার পূজা নেবেন না। অপারেশন করতে যাবার আগেও সার্জন বললেন এক সপ্তাহ বিশ্রাম নিলেই আপনি ফিট হয়ে যাবেন। কিন্তু অপারেশনের পর রিকভারি রুমে যাবার পর বললেন, আমরা যতটা সহজ ভেবেছিলাম ব্যাপারটা ততটা সহজ হয় নি। এবারে আপনি কোন পূজাই করতে পারবেন না। খারাপ লাগছিল কিন্তু দ্রুত সুস্থ হবার চেষ্টা শুরু করতে লেগে গেলাম। মেদিনীপুরে জানানো হলে শ্রুতিসারানন্দজী নানা রকমের চেষ্টা করেছিলেন যাতে আমি যেতে পারি, কিন্তু মঠ থেকে অনুমতি পাওয়া গেল না। মনে করলাম, ভালই হল এবারে মঠের পূজা দেখব। আমি কখনও মাঠে যে পূজা হয় তার দেখিনি। হঠাৎই দ্রুত সুস্থ হতে থাকলাম। অপারেশনের জায়গাটি রোজ দুবেলা ড্রেসিং করাতে যেতাম আর আরোগ্য ভবনের যে ভাইটি ড্রেসিং করে দেন তিনি বলতে থাকেন, ‘আজ তো দেখছি কালকের থেকেও ভালো’।

চতুর্থীর বিকেলে সাধারণ সম্পাদক পূজনীয় স্বামী সুহিতানন্দজী ডেকে পাঠালেন। বললেন, "কিরে, মন খারাপ হচ্ছে?" আমি ইতিবাচক উত্তর দেবার পর বললেন, "আমরা এবার তোকে দিয়ে একটা অন্যরকমের পূজা করাতে চাই। এতদিন মন্ত্র দিয়ে মায়ের পূজা করেছিস এবার শব্দ দিয়ে পূজা করতে হবে। দূরদর্শন যে পূজার সম্প্রচার করে তার ধারাভাষ্য দিতে হবে"। মায়ের করুণার কথা ভেবে হৃদয় অশ্রুসিক্ত হল। শুরু হল অন্য রকমের পূজার প্রস্তুতি।

দূরদর্শন থেকে আমার বলার শিডিউলটি পাঠালেন। সপ্তমী, অষ্টমী, কুমারী-পূজা আর নবমীর সকালে

বলতে হবে বাকি সময় চন্দ্রকান্তানন্দজী বলবেন। দূরদর্শন থেকে বিগত বছরের সিডি পাঠালেন যাতে আমি প্রস্তুত হতে পারি। মন্দিরের পিছন দিকে অস্থায়ী স্টুডিও। তিনটি বড় মনিটরে একটাতে যে ছবি দেখে আমরা ধারাভাষ্য দিচ্ছি, আরেকটায় যেটি সদ্য এডিট হয়ে এসেছে আর শেষেরটায় যেটা সম্প্রচারিত হচ্ছে। কানে লাগানো আছে হেড ফোন সেখান থেকে নির্দেশ আসছে মাঝে মাঝে। আর হাতে মাইক যার সামনের দিকের বেরিয়ে থাকা অংশ আমার ঠোঁটকে ছুঁলেই মাইক অন্ হয়ে যাবে। সামনে দুর্গা পূজার মন্ত্রের খাতা, মন্ত্রের অর্থের সংকলন, বেলুড় মঠের দুর্গা পুজা সংক্রান্ত নানা গল্পের কালেকশন আর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র।

আমরা প্রথম থেকেই ঠিক করেছিলাম নিজেরা কিছু অতিরিক্ত বলবনা। চেষ্টা করব দর্শকেরা যেন মন দিয়ে পূজা দেখতে পারেন। তাই মন্ত্র উচ্চারন হয়ে গেলেই পরের উপাচার নিবেদন করার আগেই সহজ কথ্য বাংলায় আগের বলা মন্ত্রের অর্থ বলে দেওয়া হত যাতে দর্শক ওই অনুষ্ঠানটির সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করতে পারেন। কোন পূজা শুরু হবার আগে অবসর সময় বলা হত সেই পূজা কেন হচ্ছে এবং এই নিয়ে ঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজি ও পার্ষদদের কোন আনন্দময় স্মৃতি বলতাম। আমরা চেষ্টা করে ছিলাম সবটাই সাধারণ কথ্য ভাষায় বলার, এমনকি খুব সচেতন ভাবে শক্ত বাংলা শব্দ বলে ধারাভাষ্যকে ভারী করতে চাইনি।

সম্প্রচার শুরু হল। ছবি দেখছি আর বলছি। মনে হল আমার দুটো পাখা লেগেছে - আমিও ক্যামেরার সাথে মায়ের খুব কাছে চলে গেছি। ছবি দেখছি আর বলে চলেছি, একসময় অনুভব করলাম দুচোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ছে। আনুষ্ঠানিক পূজা না করতে পারার দুঃখ আনন্দের অশ্রুতে রূপান্তরিত হয়েছে। এতদিন মেঝেতে বসে উপরের দিকে তাকিয়ে পূজা করতাম আর এবারের পূজা যেন মায়ের কোলে উঠে মাতৃনাম করার আনন্দ। মনে পড়ে যাচ্ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের কথা, ‘বাড়িতে মাছ এসেছে, মা জানেন কার পেটে কি সয়। তাই কাউকে দিয়েছেন মাছ ভাজা, কেউ পেয়েছে মাছের ঝোল, কারুর জন্য হয়েছে মাছের কালিয়া আর কেউ খাচ্ছে মাছের অম্বল।’

পর্ব একুশ

পূজার একটা বড় স্তম্ভ হল পূজার কাজে যাঁরা সেবকের ভূমিকা নিচ্ছেন। বারাসত মঠের কথা মনে করলে প্রথমেই চিত্তবাবু, তমালদা, দেবুদা, সৌমেনদা, গোপাল, শঙ্কর এদের কথা মনে পড়ে। আমরা যখন মন্দিরে কাজ শিখছিলাম আমাদের প্রথম শিক্ষার বিষয়বস্তু ছিল কেমনকরে একটা কথা বা শব্দ না করে নিখুঁত কাজ করা। বড়রা বলতেন, সব সময় মনে রাখবে ঠাকুর গর্ভমন্দিরে বসে বসে তোমার গলাবাজি সহ্য করছেন আর মা ভাণ্ডার ঘরে বসে তোমার এই আচরণ দেখে বিস্মিতা হচ্ছেন। তাঁরা উপস্থিত আছেন এই ভাবটিকে মাথায় রেখে নিখুঁতভাবে নিঃশব্দে কাজ করো।

রাজকোট মঠে দেখেছিলাম এক দল যুবক মায়ের তিথিপূজার দিন মন্দিরের বেসমেন্টে বসে ভোগ রাঁধছে। একদল সবজি কাটছে, একদল ধোয়াধুয়ি করছে, একদল রান্না করছে, আর বাকিরা সাজাচ্ছে সেই রান্না করা খাবার। এত কাজ চলছে কিন্তু হিমালয়ের মত স্তব্ধতা বিরাজ করছে।

মেদিনীপুরে আমার মায়ের বালক সেবকরা মুখ বন্ধ করেই কাজ করত। কিন্তু বড়রা গলায় প্রায় ১০০ ডেসিবেল শব্দ করে কাজ করত - দিগন্তদা, চণ্ডীদা, চান্দুদা। আর তাদের মধ্যে শান্ত ও মৃদুভাষী শুভাশীষ। সর্বাবস্থায় সমস্ত পরিস্থিতে সে শান্ত। বর্তমানে তার সব কর্তব্য সমাধা হতে ভাল চাকরি ছেড়ে

সন্ন্যাস নিয়ে বৃন্দাবন মিশনে সেবারত। নিমাইদা ছিলেন সরকারী কর্মী। মা ছিলেন একমাত্র বন্ধন। তিনি মর্ত্যশরীর ত্যাগ করা মাত্র উত্তর কাশী থেকে সন্ন্যাস নিয়ে নিজানন্দ নাম গ্রহনপূর্বক বাকি জীবন মেদিনীপুর মঠে কাটিয়ে দিলেন। ওনার কথা মনে পড়লে আমার ঠাকুরের একটা কথা মনে পড়ে, কেরানীর কোন কারণে জেল হয়েছিল। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সে কি ধেই ধেই করে নাচবে? সেআবার কেরানিগিরিই করবে। নিমাইদা যেমন ছিলেন দুর্গা ভান্ডারের নিষ্ঠাবান সেবক, নিজানন্দ হয়েও তেমনি নিষ্ঠা রেখে মায়ের সেবায় রত থেকেছেন।

চন্ডীদা আমাদের প্রধান ভান্ডারী। মেদিনীপুর শহর থেকে অনেক দূরে তাঁর স্কুল। সেখানকার তিনি হেডমাষ্টার মশাই। সেই কাজ সামলে পূজার আগে একটু একটু করে পূজার প্রস্তুতির কাজ সমাধা করতেন। আর পূজার কদিন আশ্রমের পূজা পরিচালনা করতেন। শিক্ষকমশাই বলে স্টুডেন্ট সাইকোলজি বুঝতেন খুব ভালো। কখন বকতে হবে, কখন প্রশ্রয় দিতে হবে আর কখন ভালবাসতে হবে সেটা ছিল নখদর্পণে। পূজা চলাকালীন আমি ছদ্মরাগ দেখাতাম কিন্তু জানতাম আমার সাথে আর কেউ না থাকুক চন্ডিদা আছেন। চণ্ডীদা ছিলেন সত্যিকারের নেতা। সব কাজে সবার আগে থাকতেন। সে বেদি বানানো, মহাস্নানের জোগাড়, সন্ধি পূজা, কুমারী পূজা, হোম, দেবী বরণ, বিসর্জনের সময় কংসাবতী নদীতে নামা, বালকদের গুণে গুণে ফেরত আনা, কিংবা শান্তি জল দেওয়ার সময় সাহায্য করা। খুব সুখকর ছিল তাঁর সঙ্গে কাজ করার স্মৃতি। চন্ডিদা ব্যক্তিজীবনে অত্যন্ত সফল শিক্ষক - প্রধান শিক্ষক - তাঁর স্পর্শে যেমন খুব ভাল ছাত্র ছাত্রী তৈরি হয়েছে তেমনি তাঁর ভাঙ্গা চোরা বিদ্যালয় অত্যন্ত সুন্দর ও আধুনিক হয়েছে। বর্তমানে তিনি অবসর নেবার পর মেদিনীপুর আশ্রমের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও ওখানকার দুর্গা পূজার তন্ত্রধারক।

মেদিনীপুরে পূজা করার স্মৃতি মনে এলে সব ভুল হয়ে যায়। ২০১৭ সালে মেদিনীপুরের মহারাজরা আমাকে আর নিতে চাইলেন না, তাই সেই বছরই শেষ হল মেদিনীপুর যাওয়া। পরের বছর ওনারা আবার আমাকে ডেকেছিলেন কিন্তু তখন আমি মঠের নির্দেশে অন্য খেয়ায় পাড়ি দিয়েছি।

পর্ব বাইশ

মেদিনীপুর মঠে দশমীর দিন একটি খুব সুন্দর প্রথা ছিল। শান্তি জল নেওয়া ও গুরুজনদের প্রণাম করা হয়ে গেলে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক - দুর্গা ভাণ্ডার, মন্দির, বুক সেলস কাউন্টার, জুতা ঘর - সবাই এক সাথে সাধু নিবাসের দোতলার ছাদে বসে চপ মুড়ি খাওয়া হত। শুরুর দিকে পূজার শেষে দক্ষিণান্ত করার সময় কাঞ্চনমূল্যর সঙ্গে আরও ২৫ টাকা করে দেওয়া হত - তাই ছিল এই মিলন মেলার মূলধন। পূজা করার দক্ষিনা, দুর্গা নাম জপের দক্ষিনা, দেবী মাহাত্ম্য পাঠের দক্ষিনা আর পূজা পরিচালনা করার দক্ষিনা, প্রতিটি ২৫ টাকা করে মোট ১০০ টাকা। এর থেকে ৭৫ টাকা চপ ফান্ডে দেওয়া হত। এছাড়া কুমারী পূজার ছবি যা কাগজে প্রকাশিতহত তাতে কারুর পুরো ছবি উঠলে ২৫ টাকা আর পেছন থেকে উঠলে ১০ টাকা নেওয়া হত। এই সামান্য টাকায় আমাদের আনন্দ উৎসব।

পূজনীয় শ্রুতিসারানন্দজী অধ্যক্ষ হয়ে এলে উনি এই ২৫ টাকার অঙ্কটা বদলে প্রতিটির জন্য ৫০০ টাকা ধার্য করেছিলেন। জগন্নাথ মন্দিরের সামনে বিখ্যাত বৌদির দোকানের চপ আসত। আর আমরা সবাই সেই চপ আনন্দ করে খেতাম। ছবিও তোলা হত অনেক। আমি মোটা মানুষ, চারদিন দীর্ঘ সময় বসে পূজার করার ফলে গায়ে ব্যথার কারণে উঁচুতে বসতাম। বাকিরা সবাই কাছাকাছি। কি আনন্দঘন

সেই মুহূর্ত সে বলে বোঝানোর নয়। সবাই হাসছি কিন্তু কেন হাসছি কেউ জানি না। প্রচলিত ধারণা আছে গিরিরাজ ঘরণী মেনকা নবমীর নিশীথ এলে কেঁদে ভাসাতেন। আমরা প্রতিবার সে গান গাইতাম কিন্তু হৃদয়ে সেই ভাবটি আনতে পারতাম না। কিন্তু দশমীর এই সন্ধ্যা এলে এই চপের আসরে বসে সেই বিরহ ব্যথা আমরা সবাই অন্তরে অনুভব করতাম। প্রার্থনা ও করতাম এই সন্ধ্যা যেন শেষ না হয়। কিন্তু সন্ধ্যা আগামী মিলনের আশ্বাস দিয়ে অপসৃত হত, রেখে যেত তার অনুপম স্মৃতি সৌরভ।

অন্তিম পর্ব

২০১৭ সালে মেদিনীপুর মঠ থেকে জানানো হল এবার ওখানকার সন্ন্যাসীই তন্ত্রধারক হবেন, আমাকে আর তাদের দরকার নেই। বেলুড় মঠ থেকে ঠিক হল সে বছর পোর্ট ব্লেয়ার আশ্রমে যেতে হবে। পূজারী পূজনীয় দীপাঞ্জন মহারাজ (বর্তমানে স্বামী উর্জিতানন্দজী)। দক্ষ পূজারী তাই আমাকে খুব বেশী কষ্ট করতে হল না। প্রতিবারে মেদিনীপুরের গাড়ী আসত মঠ থেকে পূজার গঙ্গাজল নিতে। সেই অনেক গঙ্গা জলের পাত্রের সঙ্গে আমারও জায়গা হত। এবারে যাত্রা বিমানে। আমরা দুজন ছাড়াও আরো দুজন স্বেচ্ছাসেবী গিয়েছিলেন।

সকাল দশটা নাগাদ বিমান থেকে মাটির পৃথিবীতে নামলাম। আশ্রম থেকে পূজনীয় কাশীনাথ মহারাজ এসেছিলেন। ঠাকুর মন্দিরটি সুন্দর। তার থেকেও সুন্দর মন্দিরের সামনের অংশটি। মন্দির থেকে বেরিয়ে রাস্তা পেরোলেই সমুদ্র। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকুন, অনুভব করবেন সমুদ্র আপনার সব দুঃখ ব্যথা অপহরণ করে নিয়েছে।

ক্ষুদে আন্দামানী ছেলেদের হোস্টেল নিয়ে এই আশ্রম। রোজ বৃষ্টি হয় আর যেহেতু মিষ্টি জলের অভাব, তাই বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য দুটি পুকুর। বৃষ্টি হওয়া মাত্র সেই জল দ্রুত চলে যাবে সেই পুকুরে। সবার বাড়ী খুব দূরের কোন দ্বীপে, যাতায়াত খরচ সাপেক্ষ, তাই কারুর অভিভাবকরা তাদের নিয়ে যেত না। তাই এই পূজায় ছাত্রদের ভূমিকা ছিল অসাধারণ।

এক চালার প্রতিমা কিন্তু কেমন পুতুল পুতুল দেখতে। মাতৃরূপ কম যোদ্ধা রূপটাই প্রাধান্য পেয়েছিল বেশী। লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গনেশ অনেকটা শিক্ষিত জাতির মত, বাইরে যাই হোক না কেন, আমরা রবীন্দ্র গান ও কবিতা পরে নিরপেক্ষ ভাব বজায় রাখব তেমন নির্লিপ্ত প্রতিমার মত।

বিকেলে ঘুম ভাঙ্গার পর বারান্দায় আসতে একটা অসাধারণ সৌরভ পাওয়া গেল। নারকেল নাড়ুর পাক হচ্ছে। সারা আশ্রম সেই গন্ধে মম করছে। সেই নারকেল নাড়ুর সৃষ্টিকর্তী মায়েদের সঙ্গে আলাপ হল। এনারা সবাই সারদা সংঘের সদস্যা। এত বড় দুর্গা পূজার পুরো দেবী ভোগ এনারাই রান্না করেন। ভোর বেলা সবাই এসে যেতেন। সব্জী কাটা, রান্না করা, ভোগ সাজানো ও সেই ভোগ মণ্ডপে নিয়ে যাওয়া সবটাই ওনারা করতেন নিখুঁতভাবে, নিঃশব্দে আর একেবারে ঘড়ি ধরে।

পূজা আরম্ভ হল। মনে হল পুতুল খেলা দেখছি। ছোট ছোট ছেলেরা পূজার জোগাড় দিচ্ছে। একদল ভোগের টেবিল দিয়ে গেলেন, একদল তাতে নৈবেদ্য নামালেন হয়ে গেলে আরেক দল তুললেন, আরেকদল টেবিল তুলে নিলেন, আরেক দল জায়গাটা সঙ্গে সঙ্গে মুছে দিলেন। মনে হল যেন কেউ পুতুলে দম দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। অপূর্ব সে দৃশ্য -একদল শিশু ভোলানাথ প্রানপণে দেব সেবায় মগ্ন।

পূজা দেখার লোক নেই বললেই চলে। সারদা সংঘের মায়েরা ভোগারতিতে ও অঞ্জলী দিতে আসতেন, সঙ্গে হোস্টেলের ছেলেরা ও অষ্টমীর দিনে কুমারী পূজার সময় সর্বোচ্চ ২১ জন ভক্ত এসে ছিলেন।

নির্বিঘ্নে পূজা শেষ হল। প্রতিমা বিসর্জনের জন্য নির্দিষ্ট ছিল পিয়ারলেস হোটেলের নিজস্ব বীচে। কিন্তু যে দৃশ্যটি দেখার জন্য আমি একেবারে প্রস্তুত ছিলাম না সেটা হল প্রতিমার চেহারা। প্রথমে মনে হয়েছিল প্রতিমা একচালার - বিসর্জনের সময় দেখলাম সব কটি প্রতিমা আলাদা। দেবী সিংহ মহিষাসুর এক সাথে বাকিরা আলাদা। যেন ভেঙে যাওয়া পরিবার কদিনের জন্য একসঙ্গে থেকে আবার আলাদা হয়ে রওনা দিলেন নিজ ভূমে। কেমন একটা আবেগ শূন্য অবস্থা। ছাত্ররা খুব আনন্দ করল বিসর্জনের সময়। পরের দিন আমরা গিয়েছিলাম সেলুলার জেল দেখতে। আর তার পরের দিন রওনা দিলাম কলকাতার উদ্দেশ্যে।

বিমানবন্দরে নেমে যে যার পথে চললাম। অধ্যক্ষ মহারাজ গেলেন বেলুড় মঠে, পূজারী আর আমি রওনা দিলাম নরেন্দ্রপুরে আর স্বেচ্ছা সেবকরা তাঁদের বাড়ী নদীয়ায়। আমাদের অবস্থাও সেই প্রতিমার মত একটা উপলক্ষকে কেন্দ্র করে আমরা একত্রিত হলাম এবং তো শেষ হতেই আবেগ শূন্য অবস্থায় রওনা দিলাম আপন আপন পথে।

আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ পূজনীয় স্বামী স্তবপ্রিয়ানন্দ মহারাজজীর কাছে আমাদের অনুরোধে তাঁর এই অসাধারন স্মৃতিচারণা আমাদের উপহার দেওয়ার জন্যে। মহারাজজী বর্তমানে রামহরিপুর আশ্রমের সম্পাদক।

Avisha Dey - 9 years

Srinithi Banerjee - 9 years

AnsprechBar – das 2025er Projekt – sprachbegabt, international, künstlerisch, lebensnah

Rosa Hauch und Yvonn Spauschus

Die globalen Herausforderungen wachsen, die Aufgaben auch und wir wachsen einfach mit. Unser Team: Wir kommen aus Mexiko, England, Libyen, Tunesien, Kasachstan, Italien, der Ukraine und Deutschland. Wir reden und arbeiten zusammen, sprechen andere an, mit uns gemeinsam zu schreiben, zu malen, zu basteln, zu sticken oder sieb zudrücken. Schon klar, dieses Wort gibt es offiziell nicht. Normalerweise würde man sagen, wir machen Siebdruck oder stellen Siebdrucke her. Unser Auftrag: mit Menschen ins Gespräch kommen, ansprechbar sein.

Doch was ist schon normal?

Sich einfach anzusprechen, ist nicht mehr normal und die Gründe sind vielfältig. Viele wollen ihre Ruhe haben, fürchten Überraschungen und plötzliche Begegnungen, sind pandemiegeschädigt, haben grundsätzlich Angst vor Fremden, fühlen sich einsam und kommen da nicht raus, einige können die Sprache nicht, manche haben Stress, wieder andere haben es verlernt, weil es üblich geworden ist, bevor man telefoniert, über Nachrichten abzuchecken, wann es passt, sich anzurufen. Vor Jahren haben wir einfach geklingelt, unter Umständen auch mal einen Weg umsonst gemacht, aber viel öfter schöne Begegnungen gehabt, unkompliziert, nicht durchgestylt, weder aufgeräumt noch dem Sternekoch nacheifernd.

Dieses - einfach so - gehört auf die „Rote Liste“.

Das sehen sowohl die Heidehof Stiftung GmbH als auch das Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt so, die Fördergelder für das Projekt geben. Der Sächsische Landtag reicht sogar Steuergelder im Rahmen des Landesprogrammes Integrative Maßnahmen aus.

Wir sind demnach nicht allein mit dem Gedanken, es müsse Orte Ort kreiert werden, an denen man sich ansprechen kann, idealerweise mobil, um möglichst viele Menschen zu erreichen.

Und so sind wir on Tour in Dresden. Stadtteilfeste, Kunstereignisse, Straßenevents haben sich bewährt, die Bar zum Ansprechen zu eröffnen. Wie ein Popup Store sind wir mal in Striesen, mal in Prohlis, in Gorbitz, in der Neustadt oder im Zentrum.

Die Gespräche sind individuell, gleich ist die gute Erfahrung, die die Leute vermisst haben. Einfach mal reden, auf den Tresen legen, was einen, was eine bewegt

Geht es um die deutsche Sprache, kommen kuriose Worte zum Vorschein. Kein Mensch kann fehlerfrei Streichholzschächtelchen aussprechen. Warum schießt eine Gulaschkanone nicht? Cozze ist nichts Unanständiges, so nennen Italiener das,

was in Deutsch Miesmuschel heißt. Wie denn nun? Berliner, Krapfen, Pfannkuchen oder Eierkuchen, egal, Hauptsache süß.

Stundenlang erfreuen wir uns an Unaussprechlichem, Unübersetzbaren, Kontroversen.

In einigen Workshops entstehen nebenbei dazu Kunstwerke, gestickte Bilder, Kalligraphiertes, Gemaltes, Gedrucktes. Diese Kombination von etwas mit den Händen tun und erzählen können wir zwar nicht zum Patent anmelden, jedoch ist es genau das Erfolgsgeheimnis, warum das Projekt funktioniert. Unser Gehirn braucht wahrscheinlich einen Auslöser oder Ablenkungsmoment. So wird es leichter, sich zu unterhalten.

Wie bei deutschen Partys

Bei deutsch geprägten Homepartys ist es zum Beispiel so, dass sich fremde Menschen in der Küche beim Abwasch treffen und so ein Gespräch entsteht. Auch dabei gibt es den Effekt, dass man und frau dabei feststellt, wir sind uns sympathisch, erfahren etwas über die Art und Weise, wie jeder so mit den Gastgebern in Verbindung steht und was sonst noch interessant ist. Schließlich hält man sich am Wischtuch fest und möchte diesen Moment so lang wie möglich ausdehnen. Dass wir vorher stundenlang stumm am Tisch gesessen haben, wirkt im Nachhinein sehr unnötig.

Es gibt also Bedarf nach einer Anleitung zum Ansprechen.

Diese Anleitung sollte sich allerdings von allgemeinbekannten Bedieninstruktionen unterscheiden. Und schon sind wir wieder an unserer ansprechBar und fragen vielleicht

-Wie gefällt es dir hier? -, um ins Gespräch zu kommen. Und um mit möglichst vielen Menschen ins Gespräch zu kommen, lernen wir gerne dazu. Wie spricht man z.B. jemanden in ´Bengali an? Schreibt es uns.

Foto 1 (oben): Das Team mit Rosa Hauch,
Foto 2 (rechts); Rosa Hauch an der Ansprechbar

আধুনিক সভ্যতা

পাপিয়া দাস

আমরা আধুনিক, আমরা সভ্য,
শিক্ষিত আর উন্নত।
দেশের হোক বা নিজের রুচি,
সব কিছু আজ শুধু সোশালমিডিয়ায় খুঁজি।
নিজের চাওয়া আর অতৃপ্ত না পাওয়া,
সবই আঁকি আর লিখি ওয়াল নামক কলামে।
পাঁচটা মন্তব্য আর পঞ্চাশ তা পছন্দের জেরে,
সেদিন আমি একশো কোটির সেলিব্রিটি,
যন্ত্র আর যান্ত্রিক দুনিয়াতে।

আমার আমি

পাপিয়া দাস

আমার আমিকে নিয়ে ছুটছে সবাই,
চাহিদা,অবিশ্বাস আর অহংকারের বোঝা নিয়ে।
তুমি-আমি ভাই, সবাই এ পথের পথিক,
কেন যে নিজেকে চিনি না সঠিক।
কেন, ভাবি না দাঁড়িয়ে দুদণ্ড,
হবো না আমি নির্বোধ, অভিলাষী ভন্ড।
চোখের জালনা খুলে, মনের শেকল তুলে,
গন জোয়ারে ভাসবো না আমি ;
আঁকবো না আমি, আমার পায়ে
ওদের প্রতিধ্বনির পদচিহ্ন।
নিজেকে স্বতন্ত্র করে, মায়া মোহ উপরে ফেলে,
আমি হবো নিস্কলুষ নিস্কলঙ্ক।

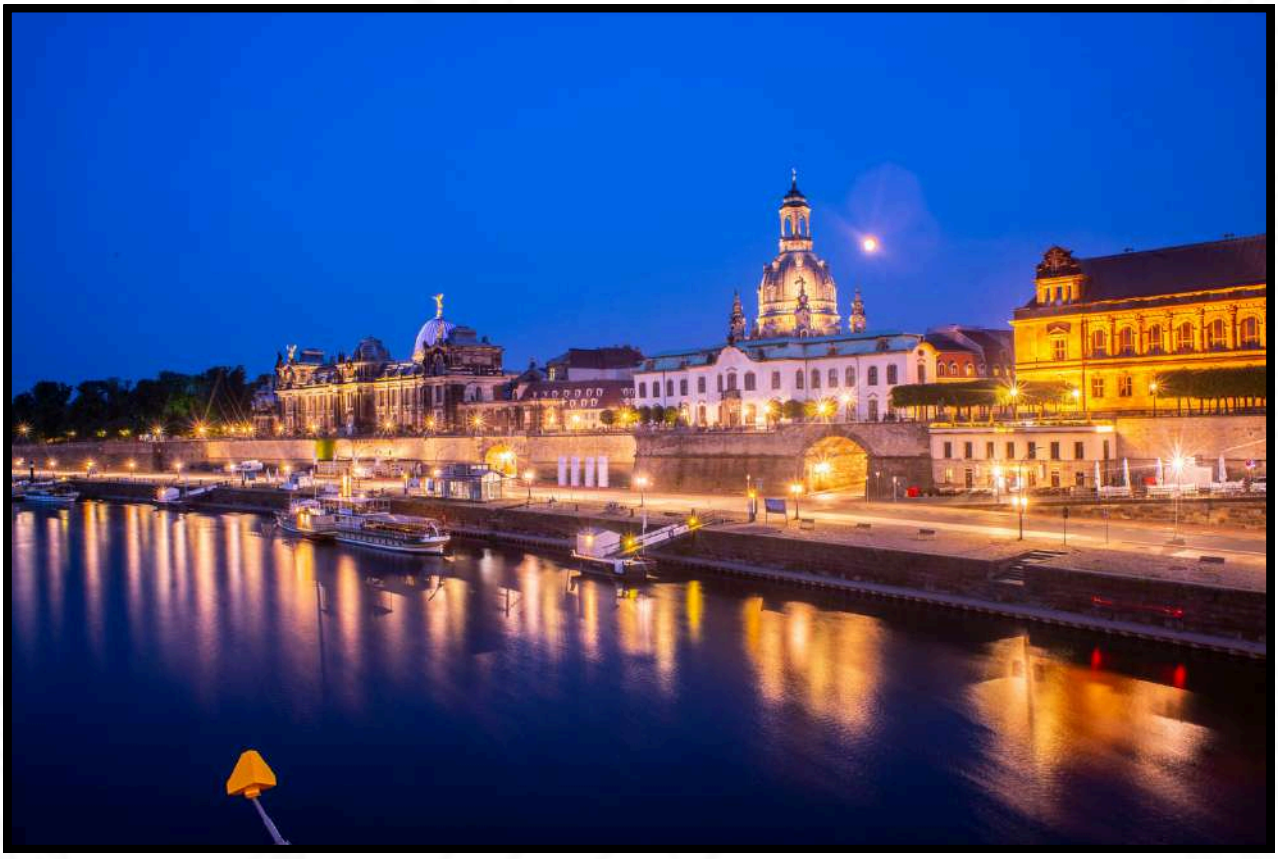

Shades of Dresden - Arkasarathi Gope

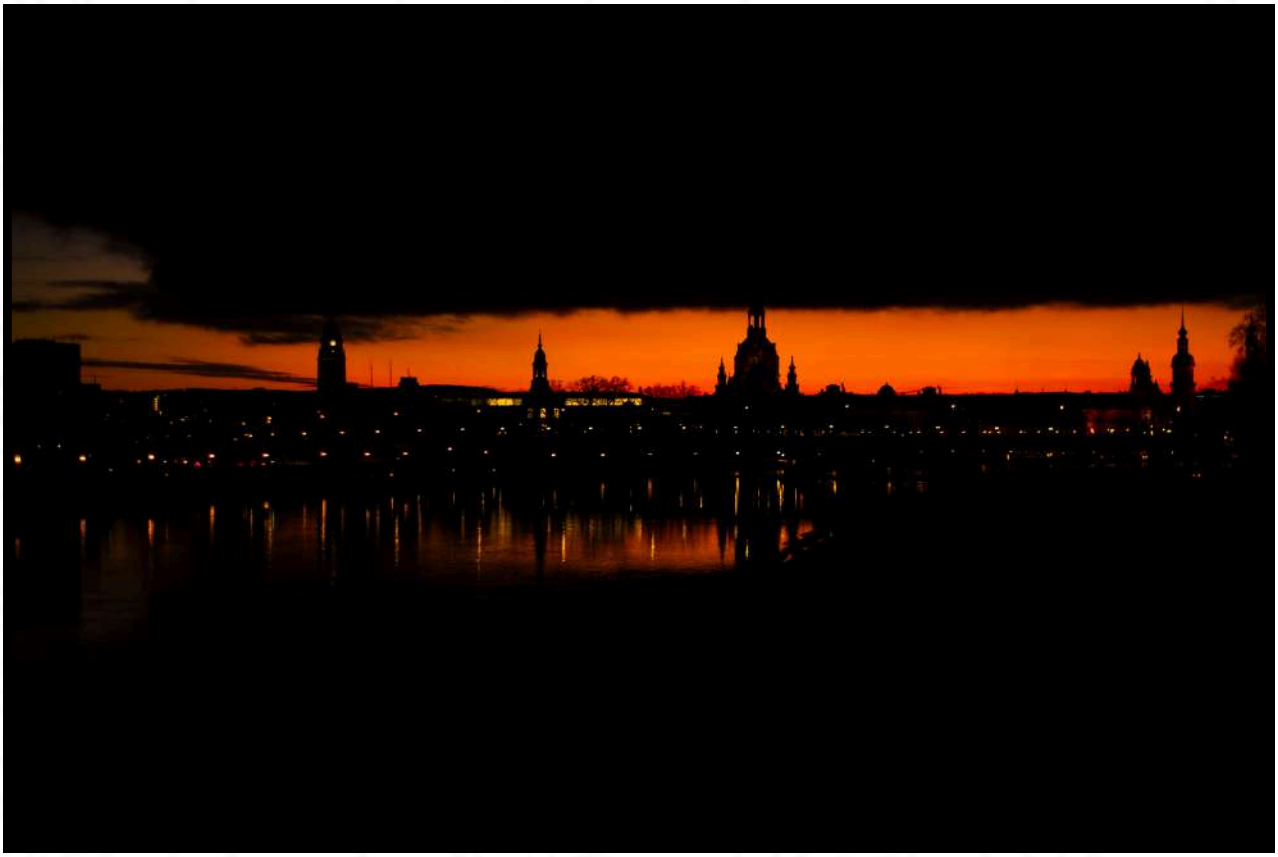

Bountiful - Swarup Bose [Oil on Canvas]

Supratim Mandal- 3 years

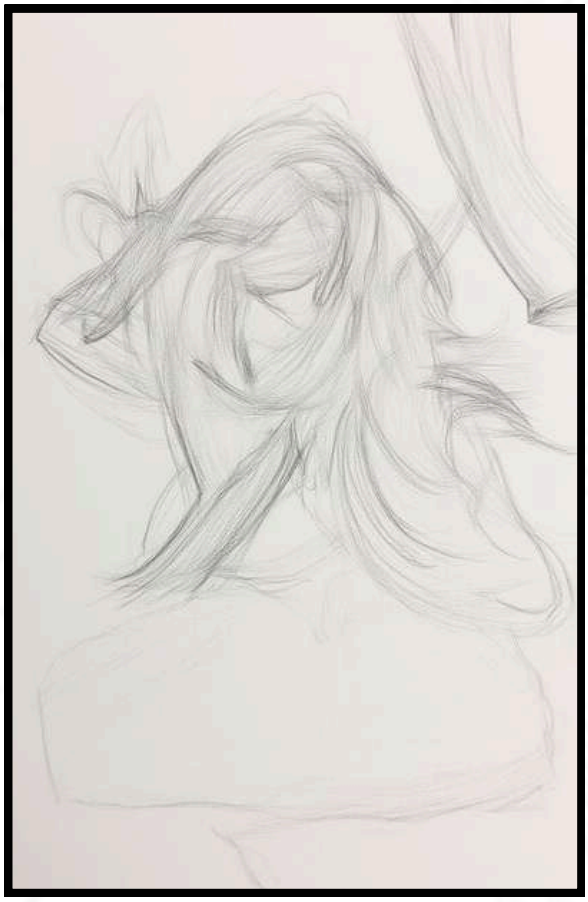

Mihiparna Das- 3 years

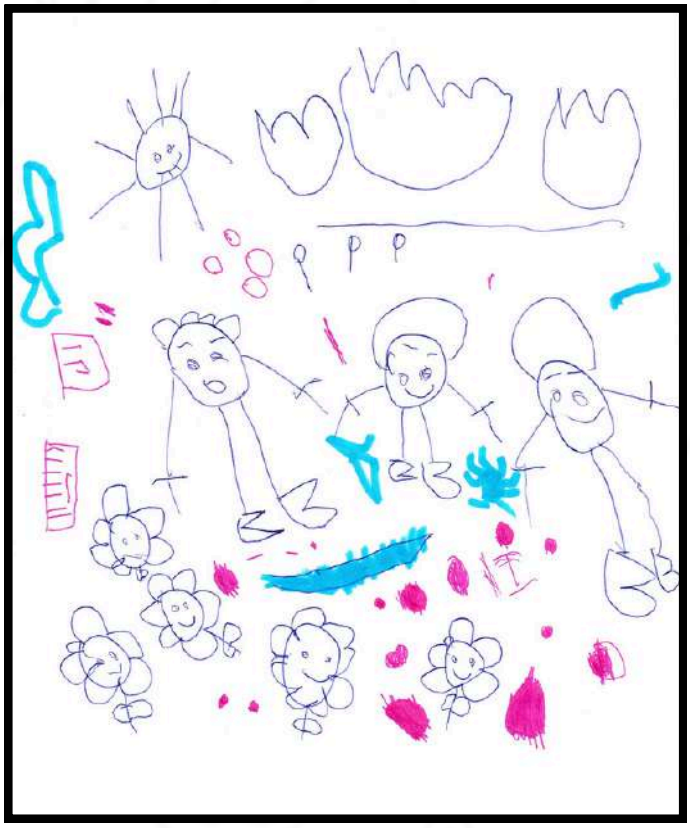

Triana Sarkar- 4 years

In Memory of My Mother

Mita Mitra

Tapati Mitra (née Guha)
b. 17 Oct. 1922, d. 30 Nov. 2014

On my bookshelf is a photo of my mother, a beautiful woman sitting with her hands folded on her lap. My writing explores her life story, which was centered around her abiding love for her three daughters.

My mother's stories about Dacca reveal her childhood and youth, whereas our own memories of her in Calcutta evoke her motherhood. I describe my mother's last years in Auckland from my own point of view.

Early years in Dacca

When I got home from school in the afternoon, I would play in my mother's room or lie down next to her, listening avidly to stories of her youth. I could hear cars and also street vendors hawking their wares as they walked past our Lake Place home. My mother's story, however, would transport me to another place and time. She spoke wistfully of her early years in Dacca: *'Our villa stood in Tikatuli neighborhood. The entrance to the villa was flanked by columns, and a portrait of King Edward VII hung on the hallway. Didima used to say that he was her king.'*

My mother remembered the garden swing, picturing herself laughing and reaching up to the sky once more. The swing was specially made for her by her father. He passed away while meditating in his prayer room when she was only 12 years old.

Reminiscing about old school memories at Kamrunnesa, my mother mentioned her love of dancing, and she has passed on to me her love of recitation. On Tagore's birth anniversaries, she used to recite his poems at school concerts. She was also a good sportswoman, and I have a keepsake, a silver medal that she had won in a competition.

A wedding ceremony

On 27 July 1943, my mother got married in Calcutta and a reception followed in Jalpaiguri, a town in North Bengal. Looking through my collection of memorabilia,

I was surprised to find a copy of the invitation card. The card reminded me of the ceremony that my mother had described to us: a ride on an elephant's back with musicians accompanying her to the reception place.

She had also shared an amusing story of her wedding night. Following the Bengali custom of phool shojja, the bridal bed was decorated with flowers. When her relatives escorted her to the bridal room, they found the groom had fallen asleep on the canopied bed.

Married life

As a newly wed, my mother had to adjust to life in a large household. Also, the entire family relocated regularly due to my grandfather's work as a police superintendent. Living in Darjeeling and Kalimpong exposed her to the iconic beauty of the Himalayas and to the Buddhist culture that prevailed in those regions.

My aunts were fond of my mother and kept her company. I wonder, if in spite of the companionship, she had felt lonely since my father was frequently away on business at the start of his career. In the course of time, once my grandfather had retired, my parents settled in Calcutta where they brought up their three daughters.

Motherhood

My earliest memory of my mother was seeing her by my bedside in a dimly lit room. She kept vigil after I had fallen from a houseboat into the Jhelum River and had been saved by a boatsman. In one of her storytelling sessions, she recounted the event as it had occurred:

The boatsman jumped into the water as soon as he saw a child fall, while the viewers on the bank instantly assumed that his child had fallen into the river. When the boatsman surfaced, I saw that he was holding your red booty in his hand. On his second try, he pulled you out of the water.

The incident had abruptly ended our family's vacation in Kashmir valley. But as time passed, my mother's initial shock after almost losing her child to drowning became a distant memory.

My younger sister, Deepa, recalled a memorable incident when she was in class 5. It was her friend's birthday party, and she could not find a dress that was pretty enough to wear. "Without saying a word to me, Ma bought a piece of material and sewed far into the night till she finished a dress," my sister said. She adored the dress with multi-colored polka dots on white and A-line cut and wore it to the party. This was the best ever day for her.

On the other hand, my elder sister, Didi, described an incident that had ended in tears. She had been decorating a wooden chariot for *Rath Jatra* at our neighbour's house, and when she was late returning home, my mother took the chariot and flung it on the floor. On occasions, my mother was given to dramatics.

A mother's prayer

My husband has always admired my parents and he commented about them, "They were very stable. Your father went to work everyday and made sure his three daughters had an education. Your mother took care of you." For this, they have our love and our gratitude.

In one of her letters, my mother had written: *I pray to Thakur that you can lead beautiful and fulfilled lives*. The underlying desire of her life was to see us obtain a good education and have a complete life. To this purpose, she devoted herself as a mother.

In middle school, she supervised my homework. She saw to my recreational activities, taking me to yoga-classes and encouraging me to practice my guitar. When I graduated from university and got a lectureship position in English, the entire family shared in my achievements.

Our relationship became strained when I declined a marriage proposal and chose to pursue a doctoral degree in New York. When I was home on a semester break, my mother had asked me, Why did you want to study abroad when you had so many opportunities here? Despite her distress that I was living alone in New York, she had urged me to stay focused and complete my dissertation. Undeniably, the choices that we made in our lives had emotional implications for our parents.

A time for sorrow, a time for joy

My parents wrote to me regularly in New York. Their letters depict their daily activities and show the intertwinement of joy and sorrow in our family life. Didi was excited when she informed me about her forthcoming move to Auckland with her husband, Bryan, and their son, Babi. However, my parents missed them dearly when they settled abroad.

Taking care of a sister

The family dynamics changed when our aunt or Mashi came to live with my parents. She had been living in Rangoon since her marriage and had lost her husband a few years ago. Even though they had barely met since their marriages, my mother took care of her sister.

Mashi had liked Deepa, and her presence was a help when my mother was sick. Deepa did not recall any particular conversation between them, but she added, "Actually to think of it- -Ma really didn't converse a lot. And Mashi was quiet." They had been close in their own way, and my mother spoke of her deep sorrow at losing her elder sister.

Coping with cancer

When I learnt that my mother had cancer and had been given only a month to live, I felt overwhelmed. It was with a lot of love and care that my father and Deepa saw her through chemotherapy. Fearful as she may have been with the after effects of her treatment, my mother survived the ordeal.

Weddings in Calcutta and New York

This time saw Deepa navigate her future career. After graduating from university and training college, she accepted an offer to teach in a school. She has remained passionate about her work to this day.

My sister's wedding took place in Calcutta, and I have always had regrets that I missed the ceremony. Reading my parents' letters, I got a glimpse of the childhood years of her two adorable children, Ishanee and Shubro. My parents bonded with their grandchildren who livened up the quiet space in our Lake Place home. Ishanee described her grandmother's feelings towards her, *"It was unconditional love,"* she said.

As I looked out of my dormitory window on a winter day, I asked myself if this might be the last time that I would see ice floes on the Hudson River. I had dreams of marrying and living in Hamburg in future.

I called my parents to tell them about Helmut's marriage proposal, and my mother said, *We have been waiting all along for this moment*. Our wedding was a quiet affair with a small group of friends at Riverside Church in Manhattan.

In a letter dated 17 June 1998, my mother expressed her renewed hope for her three daughters: *May you stay healthy, may you stay in peace. This has always been my prayer to Bhagoban. This is my earnest entreaty.*

Coping with loss

The steady rhythm of life was broken when my brother-in-law Bryan passed away in Auckland. A beloved family member, he died too early for his time. Didi showed great fortitude, finding work at Middlemore Hospital and adjusting to her changed circumstances.

On 2 January 2001, we lost our father whom we had regarded as an anchor in our lives. In a letter, he had written down his last wish: *Take care of your mother when I am gone.*

After we had observed a one-year period of mourning, I invited my mother to Dresden.

Our cherished memories

My husband and I cherish the memory of my mother's visit and our time together with her. Weekdays saw my mother preparing Bengali dishes, which I simply loved. Weekends found Helmut joining us on excursions, where we enjoyed the panoramic view of the Elbe Valley.

On a trip to Ahrensburg to meet Helmut's family, our mothers conversed easily over tea. In a gesture of cordiality, my mother-in-law took her visitor's hand and showed her around the garden.

One unforgettable experience was our ferry ride to Föhr, an island on the North Sea, where the sea breeze and the gulls soaring above the water remained in our memories.

I like to think that the short stay with us had given my mother joy.

Relocating to Auckland

As the German saying goes, *einen alten Baum verpflanzt man nicht* or an old tree cannot be replanted. Despite the prospect of having to adapt to a new society in her old age, my mother relocated to New Zealand with Deepa's family in January 2003. In a couple of years, however, my younger sister's family emigrated to Australia because of favorable work opportunities.

Before leaving home, we burnt all the old diaries which were stored in trunks, my mother said. These diaries contained a precise record of the family's expenditures over the years. Once again my mother severed ties with her past and undertook a momentous change since her relocation from Dacca to Calcutta. Then there was the promise of a happy marriage, and now the move was for security in old age and proximity to her daughters.

On 6 June 2003, my mother wrote to my husband: *I am all right here. The neighborhood is nice, but it is very quiet. I am also a new person. In old age, it is difficult to stay alone.*

While she was staying in Didi's house in suburban Papakura, my mother found solace in reading or knitting. On my sister's day off, they went to Robert Harris café for quiches and coffee or saw a Bengali play produced by community members. My mother wore a woven charm bracelet that Ishanee had given her as a token of love.

Residing in a care facility

I was not expecting my mother to change her residence from Papakura to Erin Park care facility. It took time to feel comfortable in a senior home, but slowly she got accustomed to the routine. She was our fearless mother.

At the age of 89, she had a sudden stroke. I experienced immense sadness when I realized that she was incapacitated. A resident at the care home showed her compassion when she became cognizant of my mother's situation. Lunch was over when I saw her approaching us in the lounge. She laid her hand on my mother's, and they looked at each other without saying a word. Both of them used to participate in recreational activities and knew intuitively how the other felt.

Celebrating a milestone birthday

On 17 October 2012, my mother turned 90, and we celebrated her milestone birthday at Bethesda Care. Didi had meticulously prepared for this day, inviting all the senior residents at the care home.

Upon arrival at Bethesda, the guests and their children were treated to a magic show. Babi's seven-year-old son, Rana, lovingly offered his Borodida or great grandmother the first piece of her birthday cake.

Later, when Deepa asked our mother what she had enjoyed the most on this day, she replied, The people and the conversation around me. It was a very lively afternoon.

On January 2014, I landed early at Auckland airport, which was refurbished with Maori artwork, and I drove directly to Bethesda.

My mother was having breakfast with other residents in the lounge. I touched her feet as is customary in our culture when greeting elders. She did not look up or put her hand on my head to bless me. Instead she asked me, *Who are you?* Being told that I was her daughter, she was quiet for a moment, then asked, *Why didn't I recognize you?*

I sat with my mother during lunch and supper and took her around the rose garden in her care home. She would want me to comb her hair at night until she fell asleep. In those moments, I came to understand my mother's anguish and resilience.

It was a cold, late November morning in 2014, in our Dresden apartment. My sisters were in Calcutta and Perth, and I had been constantly trying to reach my mother. Finally, a staff member picked up the phone receiver, and I heard her say kindly, "Tapati, it's your daughter. Mita." My mother made an effort to speak, but she was incoherent. About half an hour later, when I called back, she had passed away. I have often wished that I could tell her, "Ma, call me Mitan again, and I will come and fold you in my arms."

We cremated our mother according to Hindu rites and let her ash flow in the water. When I was walking back to our car, I was about to turn my head and take a final look at the sea when our priest stopped me. "Please don't look back," he said. "Let your mother's spirit go in peace."

Aarya Syamal - 6 years

মুক্তি

অনিকেত রায়

লাস্ট মেট্রোটার লাস্ট কামরায় বসেছিল সুমন। মেট্রোটা আজ তুলনামূলক ফাঁকা। সিটের এক কোণে হেডেফানে গান শুনতে শুনতে ইনস্টাগ্রাম ঘাটছিল মন দিয়ে। ওর্ রোজকার এটাই রুটিন হয়ে গেছে প্রায়। ১০টা- ৬টার চাকরি জীবনে এইটুকুই তো ফ্রি-টাইম। টালিগঞ্জ মেট্রোস্টেশন ছাড়ল ভিড়টা আরো কমে গেল। মেট্রো যাত্রীরীতি চলতে শুরু করল আবার।

হঠাৎ হালকা ধাক্কায় পাশ ফিরে দেখলো, আর সঙ্গে সঙ্গেই যেন আকাশ থেকে পড়ল সুমন।

"রো-রোহিনী তুই?!?"

"না রে, আমি না আমার ভূত। তোর ঘাড়ে চাপতে এলাম।"

"না, না, মানে ২ বছর পর হঠাৎ তোকে এভাবে দেখব ভাবতেই পারছি না। কেমন আছিস তুই?"

"এই যেমন দেখেছিস। বিন্দাস আর টিপটপ্। তোর খবর বল্। তোর তো আজকাল আর পাত্তা নেই। ফেসবুকে কোনো পোস্টও দিস না। ব্যাপার কি তোর?"

"এই একটা প্রাইভেট ফার্মে কাজ করছি এখন। আর সঙ্গে এম.বি.এ.-এর জন্যও পড়াশোনা চালাচ্ছি বাকি সময়। কেন ফেসবুক করি না আশা করি বুঝতেই পারছিস।"

"হ্যাঁ, সে আর বলতে। বরাবর তুই যা সিরিয়াস পড়াশোনা নিয়ে। তবে আমি ভেবেছিলাম যে তুই এত ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট ছিলি, নিশ্চয় এতোদিনে দেশের বাইরে চলে গেছিস।"

"ইচ্ছা তো আমারও তাই ছিল, কিন্তু নিয়তির কাছে আমরা সবাই হেরে যাই।"

"কেন কি হয়েছে? আমি শুনেছিলাম তুই স্কলারশিপ পেয়েছিলি একটা, নাকি!"

"হুম, কিন্তু তার কিছুদিন পরই বাবা মারা যান। হার্টের অসুখের জন্য নার্সিংহোমে ভর্তি করেছিলাম। আর ঘরে ফিরে আসেন নি। তাই মাকে একা ফেলে রেখে কি করে চলে যেতাম বল্!"

"ওহ! আই অ্যাম ভেরি সরি। কাকিমা এখন তাহলে কলকাতাতেই আছেন?"

"হুম, মাস তিনেক্ হল সঙ্গে আছে। আর কত কিছুর জন্য সরি বলবি! ছাড় এ সব। তুই বল্, তুই কোথায় থাকিস এখন? কি করছিস?"

"আমি এখন শ্যামবাজারে একটা স্কুলে টিচার। শ্যামবাজারেই থাকি। সুমন তুই এখনো আমাকে ক্ষমা করিসনি, বল? ২ বছর হয়ে গেছে। তুই এখনো মুভ-অন করিসনি?"

"সবাই তো আর সমান হয় না। সবার অনুভূতিগুলোও সমান হয় না। যেটা তোর কাছে ইনফ্যাচুয়েশন, সেটা আমার কাছে সত্যিকারের ভালবাসা ছিল। আর সব থেকে বড় কথা আমাদের বন্ধুত্ব। এতোদিনের বন্ধুত্ব তুই কত সহজেই না ভেঙে দিলি?"

"সুমন, কাম অন। গ্রো আপ্। ২ বছর হয়ে গেছে সেটা। আর বন্ধুত্ব হারানোর দায় পুরোটাই তোর। আমি অখিলেশকে কতটা ভালোবাসতাম সেটা জানার পরেও তুই বলেছিলি যে ওর আর একটা সম্পর্কে জড়িয়ে। তুই কিভাবে করতে পারলি এটা? মানছি তুই আমাকে লাইক্ করতিস, তা বলে এভাবে আমার ঘর ভাঙবি?"

"আমি কি তখন ভুল বলেছিলাম কিছু ? "

"ভুল বলেছিলি! ভুল বুঝেছিলি ওকে তুই। আর ওরকম সাকসেসফুল ছেলেকে অনেক মেয়েই লাইন মারে, পাত্তা পাবার জন্য অনেকে কিছু রটায়। দেখ আমি কত সুখে আছি। তুই জানিস না, অখিলেশ আমায় কতটা ভালবাসে । ও বলেছে, সামনের বছরই নাকি ও আমায় বিয়ে করবে। তোকে কিন্তু..." কথা শেষ করতে না দিয়েই সুমন বলতে শুরু করল।

"কত মিথ্যা বলবি আর? তুই কি জানিস, তুই আজও মিথ্যাটা ঠিক করে বলতে পারিস না? তোর গলার নিচে ওই আঙুলের দাগ, ডান হাতে ওই কালসিটে পড়া দাগগুলো, তুই অন্তত আমার কাছে লুকাতে পারবিনা। এরকম একটা মানুষের জন্য এত লড়াই করেছিলি তুই? নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলি? এত কষ্ট পেয়েও কিছু জানাসনি কেন তুই?"

"কি করে জানাবো তোকে, কোন মুখ নিয়ে ফিরব তোর কাছে বল্! জেনেবুঝে তোকেই যে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছি । তবে আমি..."। কথা শেষ না করেই সুমনকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল রোহিনী।

"তবে তুই এখন মুক্তো তাই তো? তোর বা-হাতের আংটিবিহীন অনামিকা সে কথাই বলছে।"

সুমনের বুক থেকে মাথা তুলে, চোখ মুছতে মুছতে রোহিনী বলল— "ছেড়ে দিয়েছি। এক সপ্তাহ আগেই ছেড়ে দিয়েছি। তবে মুক্তি পাইনি। তাই তোর কাছে একটা অনুরোধ করছি, তুই রাখবি?"

সুমন বলল— "উফ, এসব অনুরোধ আর রাখতে পারব না। তবে তোর সাথে তোর হাত ধরে মুক্তির খোঁজ করতে পারি। এখন চল্, শ্যামবাজার চলে এসেছে, অনেকটা রাস্তা হেঁটে যেতে হবে একসাথে।"

হতভম্ব রোহিনী হতবাক হয়ে তাকিয়ে শুধু বলল— "কি করে সব বুঝে যাস তুই?"

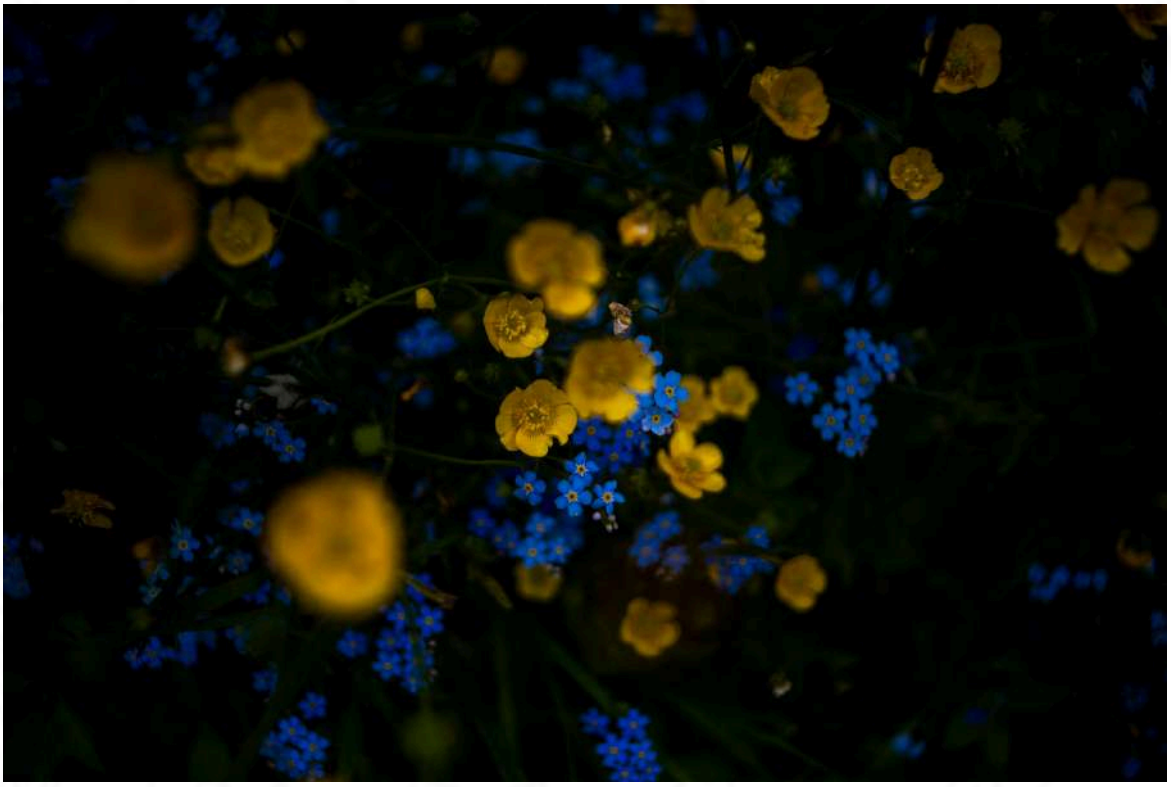

Fragrance - Arkasarathi Gope

Laufbericht zum 44. Columbus Marathon, 20.10.2024

Rosa Hauch

Für Joe, Ellie und Michael

Alle drei sind Patienten des Kinderkrankenhauses in Columbus, alle drei waren mit 23 anderen kleinen Patienten und ihren Betreuungsteams an der Marathonstrecke. Und 1381 Frauen sowie 2204 Männer gaben High five an jeder ausgestreckten übergroßen Schaumgummihand bei ihnen. Um es kurz zu machen, es war der emotionalste Marathon, den ich gelaufen bin und ich nehme an, dieses Gefühl wird nicht zu toppen sein. Die gesamten Einnahmen des Laufes gehen an das Kinderkrankenhaus. Es ist ein großartiger Charity-lauf. Insgesamt haben in allen Disziplinen rund 12.000 Sportler teilgenommen, so viel wie noch nie.

Der Weg zum Marathon

Der Weg zum Marathon führt in diesem Fall über eine Bewerbung bei der Stadt Dresden. Dresden und Columbus sind Partnerstädte und seit 2012 gibt es zwischen beiden den Marathonaustausch. Fünf Läufer aus Dresden laufen im Bundesstaat Ohio und fünf Läufer aus Columbus eine Woche später im Bundesland Sachsen, in Dresden.

Das bedeutet, wird die Bewerbung akzeptiert, zahlt der Läufer nur den Flug. Der Startbeitrag ist geschenkt und wohnen darf man in einer Familie. 2012 war Jim Tornes mein Gast. Er war damals der älteste Teilnehmer mit 83 Jahren und walkte noch die 10 Kilometer in Dresden. Damals hatte ich ihm versprochen, dass ich auch einmal in Columbus laufen werde. Jim hat zwölf Jahre gewartet und mich schließlich an der Strecke angefeuert. Unterstützt wurde er von einem seiner Söhne. Das war großartig. Ich hatte auch Familie an der Strecke. Toll.

Meine Gastfamilie

Kris Olsen hat mich mit einem kleinen Schild am Flughafen abgeholt. Wir kannten uns nicht, erkannten uns sofort und stellten fest, dass es viele Gemeinsamkeiten gibt. Wir sind beide gerne Omas, wir laufen gerne und wir lieben unseren Job. Als Kris 2012 in Dresden war, hat sie erlebt, wie bewegend es für Läufer ist, wenn sie direkt nach dem Lauf ihre Medaille bekommen und diese Medaille auch gravieren lassen können. Auf der Rückseite steht dann der Name, die Zeit und was man sonst so möchte. Kurzentschlossen rief sie ihren Mann Aaron an und sagte ihm, dass sie eine Geschäftsidee hätte. Das haben die beiden meisterhaft umgesetzt. Mit einem gewaltigen Anhänger und drei Laserdruckern fahren sie seitdem von Marathon zu Marathon und machen Läufer glücklich. Sehr glücklich. Ich habe es gesehen. Nach dem Marathon in Columbus habe ich es mir im Tender bequem gemacht und nur in glückliche Gesichter geschaut. Was für ein cooler Job.

Der Lauf am 20.Oktober 2024

Marathon ist nichts für Langschläfer. Es geht immer im Dunklen raus, es ist immer

kalt am Start, ob Mann oder Frau, alle müssen vor Aufregung ganz oft aufs Örtchen und dann rollen die Wellen langsam zum Start. In Columbus wurden wir von guter Musik begleitet. Die Rhythmen tragen dich und dann willst du bloß noch loslaufen. Doch den Startschuss übernahm nicht der Renndirektor, sondern eine Patientin des Kinderkrankenhauses. Ihre Worte rührten zu Tränen, als sie sagte, wir sind alle Kämpfer, ob gegen die Zeit oder gegen den Krebs, wir kämpfen alle und geben unser Bestes.
Und das war auch so. An jeder Meile saß ein kleiner Patient, es gab große Portraits, ein Betreuungsteam, die schon erwähnte große Schaumgummihand und Musik und dann strengt man sich an, wird munter, lächelt, hebt den Daumen, klatscht Beifall, will Optimismus zeigen, jeder auf seine Weise.
Während der 26 Meilen wurde es auch immer wärmer und mit dem Trinkrucksack fühlte ich mich gut ausgestattet. Am Tag zuvor fuhr Jim mit seinem Sohn und mir die Strecke ab. Er kannte sie auswendig, denn er ist schon ganz oft diesen Marathon gelaufen. Das war eine gute Idee, denn so wusste ich immer, was noch kommt und fühlte mich einfach besser vorbereitet.
Ich wollte unter fünf Stunden laufen und habe 4:44:30 geschafft. Damit bin ich auch unter die Top 10 in meiner Altersklasse gelaufen. Wahnsinn. Top 10 in Amerika. Mir war das gar nicht aufgefallen, aber Kris. Und so bat sie Aaron, mir nahezu einen Roman auf die Medaille zu gravieren. Es ist eine schöne Erinnerung und Bestätigung für die Tradition des Marathonaustausches.
Am letzten Tag haben wir uns noch einmal alle getroffen und die Lauffreundschaft gefeiert.

Einige Momente aus dem Marathon

Contemplation -Suparna Lala [Acrylic on Canvas]

Solitary Sentinel -Parag Desai

Safe Harbour -Parag Desai

দুপুর হলেই

চন্দ্রাশিস রায়

গলির রাস্তাটা গিয়ে লাল বাড়িটায় ধাক্কা খেয়ে দু'দিকে চলে গেছে। বাঁ'দিক ধরে সোজা বড় রাস্তা। ডানদিকে গেলে ছোট্ট চৌকো মাঠ, 'ফ্রেন্ডস ইলেভেন'। ফ্রেন্ডস ইলেভেন-এর ঠিক আগে ডান হাতের শেষ বাড়িটার মেইন দরজাটার তালা খোলে রোজ এই সময়।

সুবীর ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে ওঠে। কোনমতে প্রাতঃক্রিয়া সেরে খালি পেটেই এক গেলাস জল খেয়ে বেরিয়ে পড়ে মর্নিং ওয়াক করতে। মিনিট পঁয়তাল্লিশ হেঁটে এসে পরিষ্কার হয়ে যখন বাথরুম থেকে বের হয়, তখন ছোট্ট খাবার টেবিলটার ওপর রাখা থাকে ওর চিনি ছাড়া এক কাপ লিকার চা। গত ষোল বছরে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে বলে মনে পড়ে না । সুবীর-এর ছেলের বয়স পনেরো। ওর বেলার স্কুল। সুবীর চায়নি ছেলে ভোরবেলা ক্রিকেট ছাড়া অন্য কিছুতে মন দিক। পড়াশুনোতেও না।

সায়ন ক্লাস নাইন-এ উঠেছে এই বছর। ক্লাসের ছেলেদের তুলনায় ও একটু বেশিই লম্বা। রোগা কাঠের মতো শরীর, যাকে বলে একেবারে ঢ্যাঙা লম্বা। ফাস্ট বোলার। সুবীর সায়নকে নিয়ে স্কুটারে করে যখন ময়দান যাওয়ার জন্য বেরোয়ে, তখন বারান্দায় এসে দাঁড়ায় সোহিনী। সাত থেকে আটবার কপালে করজোর ঠুকে বাবা আর ছেলেকে 'দূগ-গা দূগ-গা' করে বিদেয় করে। তারপর স্কুটারের আওয়াজ গলির মোড়ে গিয়ে মিলিয়ে গেলে বারান্দার রেলিং-এ গোঁজা খবরের কাগজটা নিয়ে ঢুকে যায় ভেতরে।

সোহিনী'র শরীর তখনও নড়তে চায়না ঠিক করে। বিগত এত বছর ধরে রোজই ওর এত সকালে ঘুম থেকে উঠেও প্রতিদিনই যেন মনে হয় আর একটু ঘুম হলে হয়তো ভাল হতো। সুবীর খুবই হাসিখুশি মানুষ। উঠেই রোজ সকালে হাঁটতে যাওয়ার আগে, 'উঠে পড় বাবাই' বলে একটা হুঙ্কার দেয়ে। তাতেই ঘুম ভেঙে যায় বাবাই আর বাবাই'এর মা, দুজনেরই। স্বামী মর্নিং ওয়াক করতে বেরোলেই সোহিনীকে উঠে পড়তে হয়। সায়নকে ঘুম থেকে তুলে তৈরী করতে হয় প্র্যাক্টিসে যাওয়ার জন্য। সুবীর ফিরে ফ্রেশ হতে না হতেই ওর জন্য চা বানিয়ে ফেলতে হয়। ও বাথরুম থেকে বেরিয়েই যেন চা'টা দেখতে পায় চোখের সামনে। সায়ন হরলিক্স আর ফল ছাড়া কিছু খেতে চায়না প্র্যাক্টিসে যাওয়ার সময়। প্র্যাকটিস সেরে ময়দানের ক্যানটিনেই খেতে পছন্দ করে সে।

এখন সোহিনীর সেরম কাজ নেই, নিজের জন্য চা করে একটা। সে খুব কড়া মিষ্টি দিয়ে দুধ'চা খায়। র'চা তার মুখে রোচে না। রেডিওতে সকাল সাতটা অবধি রবীন্দ্রসঙ্গীত দেয়। এখনো মিনিট কুড়ি বাকি। খুব ভাল লাগে। নানান সময়ের তাবড় তাবড় শিল্পীদের গান বাজায় তখন। কিন্তু এরম প্রায়ই হয় যে খবরের কাগজটা খুলে রেডিওটা চালিয়ে দিলেও খানিক পরেই সে বুঝতে পারে যে এই রাজ্য সরকার আর কেন্দ্রীয় সরকারের লড়াইয়ের খবরের মাঝে পীযূষ কান্তি সরকার কিন্তু বড্ড বেমানান। দুটো'র একটা বেছে নিতে হলে, সে রেডিওটাই বাছে। কাগজটা বন্ধ করে দেয়।

ময়দানে ছেলেকে ক্যাম্পে ছেড়ে একেবারে বাজার করে ফেরে সুবীর। নর্থ থেকে এই সকালে ময়দান যাতায়াত করতে খুব বেশি সময় লাগেনা স্কুটারে। সুবীর ফিরে এলে আস্তে আস্তে দিনের কাজ শুরু হয় সোহিনীর। বাজার দেখে গুছিয়ে রাখা, দিনের মাছটা আলাদা করে ফেলা, সুবীরের অফিস যাওয়ার আগে জলখাবার; দেওয়ার জন্য লাঞ্চ; সায়নের স্কুলের টিফিন।কাজের মাসি আসার আগে কাচার যা

আছে সব সাবান জলে ভিজিয়ে রেখে নৈশভোজের সবজি কেটে গুছিয়ে রাখা। তার সাথে বাপের বাড়ি থেকে যদি হঠাৎ একটা ফোন চলে আসে তাহলে তো দিনের অর্ধেক সেখানেই শেষ। সুবীর অফিস রওনা দেওয়ার আগে সোহিনী ফোন ধরার কোন ফুরসতই পায়না। যদিবা তা পেয়েও থাকে, তার সঙ্কোচ হয় সকাল সকাল ওই মোবাইল ফোনটা ঘাঁটতে। সে সকালের হোয়াটসঅ্যাপ-এর শুভেচ্ছাবার্তাগুলোর উত্তর এমনিও করেনা। সে জানে ওটায় ওর বন্ধুদের একটা প্রতিদ্বন্দিতা চলতে থাকে। কে প্রতিদিন কত সকালে উঠে দিনের পর দিন সবাইকে, 'শুভ সকাল', 'দিন ভাল কাটুক', 'তোমার ব্যাবহারই তোমার পরিচয়' বা টিভি সিরিয়াল-এর রামকৃষ্ণর ছবির পাশে লেখা 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' পাঠিয়ে যেতে পারে। সবার মতন ওই সকালবেলার খেলাতে সে নেই।

সুবীর অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার ঠিক খানিক পরেই সুদিনের'মা ঢোকে। ঘর ঝাঁট দিয়ে মুছে, আগের রাতের বাসন মেজে, কাপড় কেচে সব নিয়মমাফিক ছাদে গিয়ে মেলে দিয়ে এলেও সোহিনীর যেন মনে হয় পুরো ধকলটাই তার নিজের হল। এই সুদিনের'মা কাজ যতই করুক, তার মুখ থামেনা। সে দুটো জিনিস অনর্গল ব্যায় করে; জল এবং কথা। তারওপর গতকাল সে আগামী সপ্তায় ছুটি চেয়েছে দিন তিন'এক। সোহিনী 'জানাচ্ছি', 'জানাবো', করে তখনি সম্মতি না দেওয়ায় আজ সুদিনের'মা এমনি এমনিই নানান কারন, নানান যুক্তি, দেশের বাড়ি যাওয়ার একাধিক অজুহাত দিয়ে যাচ্ছে। ঘটনাটা সেটা নয়। সে চাইলে দিয়ে দিতেই পারত ছুটি, তখনই। কিন্তু পরের সপ্তায় সায়নের রাঁচি যাওয়া। ওর বাবাও ওর সাথে যাবেন। আন্ডার-ফোরটিন ট্যুরনামেন্ট আছে। যদি শুধু লিগ ম্যাচগুলোও খেলতে হয়, তাতেও দু' সপ্তাহ তো নিশ্চিত কলকাতায় থাকবেনা সায়ন আর সুবীর। তার ওপরে কোয়ালিফাই করলে প্রায় মাস খানেক। এতটা সময় যখন সোহিনী একা থাকবে তখন সুদিনের'মা হঠাৎ করে যদি দেশের বাড়ি গিয়ে ফিরতে দেরি করে বা অযথা কামাই করে তাহলে মুশকিল। সুবীরই তাকে বলে গেছে এক্ষুনি ছুটি না দিয়ে দিতে। সেও তার অফিসের লিভ-এর ব্যাপারটা দেখে আসুক আজ। তারপর দেখা যাবে।

বেলার দিকে স্নান সেরে ছাদে গামছা-কাপড় মেলে সোহিনী যখন ঘরে এসে ঢোকে, তখন আস্তে আস্তে একটু স্বস্তি পায়। এবার তার নিজের সময় শুরু হচ্ছে। এই প্রথম সারাদিনে মনে হয় যেন ভীড় নেই। ছেলে ক্রিকেট প্র্যাকটিস থেকে ফিরে তৈরী হয়ে স্কুলের জন্য বেরিয়ে গেছে বেলা এগারোটার মধ্যে। দুপুরে সে বাড়িতে একাই খায়। কোনমতে দু'টো খেয়ে নিলে আর চিন্তা থাকেনা। আজও সে রোজের মতই করল। টেলিভিশনটা চালাতেই একটা বাংলা ছবি চলতে শুরু করল। গাঁক গাঁক করে উচ্চস্বরে বেহালা বেজে চলেছে এবং কোন এক মহিলা কর্মচারী তার অফিসের বড়বাবু'র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে ফাঁকা চেম্বারে বড়বাবুর সামনে নিজেই নিজের শাড়ি ব্লাউস টেনে ছিঁড়ে ফেলে বাঁচাও বাঁচাও করে চিৎকার করছে! বড়বাবু তো একেবারে চমকে গেছে!

সোহিনী এক মিনিটের জন্য মোহিত হয়ে গিয়ে ভুলেই গেছিল যে তার খাবারই আনা হয়নি রান্নাঘর থেকে! কোনমতে রান্নাঘরে গিয়ে একটা থালায় ভাত নিয়ে ছোট্ট খাবার টেবিলে চলে আসে। ঢাকা খুলে একটা বাটি থেকে খুবই সামান্য একটু তরকারী নিয়ে খেতে শুরু করে দেয়ে। ততক্ষনে বড়বাবুর চেম্বারে পুলিশ ঢুকে ওনাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে চলে গেছে। বড়বাবুর স্ত্রী থানায় পৌঁছে ঘটনা দেখে চমকে গিয়ে সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে যায়! সে কি কান্ড! সুবীর বাড়ি থাকলে কখনও এসব চলেনা টিভিতে। ওর দেখা উচিৎ এগুলো! সোহিনী কখনও চাকরি করেনি। সে অফিসের রাজনীতি জানেনা। কিন্তু হঠাৎ চিন্তা হল সুবীরের জন্য। ধুর! ওর নিজের চেম্বার থোড়াই আছে! কি সব যে মাথায় আসে!

সোহিনী কোনমতে ওই সামান্য একটু খেয়ে পুরো খাবারটাই তুলে রেখে দিল ফ্রীজে। রাতে সেরকম রাঁধতে হবেনা আর। এদিকে বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। বড়বাবুকে পুলিশ জামিনে ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু মাঝরাতে আহত স্ত্রী ঘুম ভেঙে কান্না জুড়েছে! সে চোখে দেখতে পাচ্ছেনা! সিঁড়ি দিয়ে পড়ে গিয়ে তার দৃষ্টি একেবারে চলে গেছে! প্রত্যেক দশ-পনেরো মিনিটে একটা করে নতুন মোড় দিচ্ছে গল্পে! নিশ্চই হিট করেছিল বইটা! সুবীর এসব বোঝেনা। বড়বাবু তাঁর স্ত্রী'র দৃষ্টির ব্যাপারটা বুঝতে না বুঝতেই ফোনটা বেজে ওঠে সোহিনীর। এখন আর কে... ভাই'এর বউ। এতো খারাপ সময় জ্ঞ্যান মেয়েটার!

ধরব-ধরব-না করেও ফোনটা ধরেই নেয় সোহিনী। বর্ষা'টাও তো একলা এখন। ওর ছেলে তাতাই'ও এই সেশনে সকালের স্কুল থেকে দুপুরের স্কুলে শিফট হয়েছে। ওর দুপুরগুলোও বড্ড একা। মেয়েটা খুব হুজুগে। এখন নতুন ফন্দি আঁটছে। সায়ন আর সুবীর'দা যখন রাঁচি যাবে তখন নাকি তাতাইকে স্কুলে দিয়ে একদিন বর্ষা চলে আসবে সোহিনীর কাছে দুপুরটা কাটাতে! আবার আরেকদিন নাকি বেলা থাকতেই সোহিনী চলে যাবে বর্ষা'র কাছে! তাতাইকে স্কুল থেকে নিতে আসার সময় বর্ষা'র সাথে ফিরে আসবে। এই পরিকল্পনাটা করে বিরাট আনন্দ পেয়েছে বর্ষা! এরম নয় যে সোহিনীর ব্যাপারটায় উত্তেজনা হয়নি কিন্তু সে ভাবে বর্ষা তো এটা এখনি করতে পারে। সোহিনী'র মনেও থাকেনা বাপ-ছেলের এই রাঁচি যাওয়ার ব্যাপারটা। কলকাতার বাইরে সায়ন-এর এটা প্রথম এত দীর্ঘ টুর্নামেন্ট। অনেকগুলো দিনের ব্যাপার।

গৃহিণীরা প্রথম সকালে খবরের কাগজ পড়েনা। এটা নিয়ে অনেক লেখেলেখি পড়েছে সোহিনী। অনেক বাংলা গল্পতেও এর উল্লেখ আছে। সোহিনীর ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। ও কিছুতেই নারীবাদী বক্তব্যের সাথে সহমত হতে পারেনা। যে কোন পুরুষমানুষকে সকালবেলা সবজি কাটা, টিফিন করা, রান্নাবাটি খেলতে বসিয়ে দাও, তারাও আর খবরের কাগজটা প্রথমে পড়ার সুযোগই পাবেনা। সকালে যে নানান কাজের চাপ। তাই হয়ে ওঠে না।

সুবীর মহৎ। হাসিখুশি। সংসারে তাঁর অগাধ মন। স্বামীদের একটু আধটু অন্য মহিলাদের দিকে টান হয় সে জানে। মনে মনে হয়ত সেটা মেনেও নিয়েছিল। বিয়ের ঠিক পরে বাপের বাড়ি থেকে বিদায়ের সময় মা আস্তে করে বলেছিলেন, একটু আধটু ভুল ত্রুটি করে ফেলে স্বামীরা, ছেড়েছুড়ে চলে এসোনা; আগলে রেখো। কই, সোহিনীকে তো জোর করে আগলে রাখতে হয়নি। সুবীর নিজেই জড়িয়ে থাকে। সুবীর মহৎ না হলেও, সোহিনী তাকে মহৎ হিসেবেই ভাবতে পছন্দ করে। যে কোন কাজ দিনের পর দিন একই নিয়মে করতে করতে দম বন্ধ হয়ে আসতেই পারে। সোহিনী'রও ওটুকুই মনে হয় মাঝে মাঝে। চাকরি করলেও তো হয়ত এরম হত। সেখানে সপ্তায় দু'দিন ছুটি পেত, এই যা। চাইলে একটা রান্না'র লোক রাখতেই পারে। মাস গেলে আর কত টাকাই বা লাগবে। কিন্তু সোহিনীই সায় দেয়েনা। ছেলেকে ক্রিকেট খেলাতে যা খরচা হয় সুবীরের, তার অর্ধেক টাকায় ওদের তিনজনের সংসার অনায়াসে চলে যায়। এর মধ্যে আবার আরো একটা কাজের লোক! বিদেশে সবাই যে যার নিজের কাজ নিজেরা করে। সেখানে তো কোন ঠিকে ঝি দরকার পরেনা কারোর! সোহিনী কেন পারবেনা? সেখানে অবশ্য যে যার নিজের কাজটা 'নিজেরাই' করে। স্ত্রীদের স্বামী-সন্তানের জন্য সারাদিন জামা কাপড় কাচা আর খাবার ব্যবস্থা করতে হয়না। স্বামীরা বরং স্ত্রী'র বাসন মেজে দেয় আর সন্তান নিজের টিফিন নিজেই বানায়। আহা, সায়নের বয়সই বা কত। যেটুকু পেয়েছে তাই যেন যথেষ্ট। এতো কিছু করেও ঠিক এরম একটা একলা দুপুর তো সে পায়!

বর্ষার ফোনটা রেখে ওর মা'র কথা মনে হয়। সায়নের দাদু-ঠাকুমাদের মধ্যে শেষ বেঁচে ছিলেন সোহিনীর মা। বছর খানেক হল উনিও চলে গেছেন। বর্ষা'টা মা'র জন্য অনেক করেছে। হুট করে মা চলে যাওয়ায় সেও একলা হয়ে পড়েছে। মা বেঁচে থাকাকালীন সোহিনীর তবু একটা যাওয়ার জায়গা ছিল। বর্ষা কি সত্যি অতটা বিশ্বাস করে বলেছে রাঁচি ট্যুর-এর সময় ওদের এবাড়ি ওবাড়ি যাতায়াতের পরিকল্পনাটা? হঠাৎ মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠল সোহিনী'র।

এসব ভাবতে ভাবতেই খবরের কাগজটা নিয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়ল সোহিনী।

ওর দুপুরগুলো কেমন গন্তব্যহীন। ছেলেকে ছোটবেলায় অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড পড়ানোর সময় পড়েছিল চেশায়ার ক্যাট-এর কথা। অ্যালিস রাস্তায় একটা দু'মাথার মোড়ে এসে পড়ে। মোড়ের মাথায় গাছের ওপর দেখে চেশায়ার বেড়ালটি বসে। অ্যালিস জিজ্ঞেস করে তার কোন পথে যাওয়া উচিৎ? চেশায়ার জানতে চায় অ্যালিস কোথায় যেতে চায়। অ্যালিস বলে সে জানেনা।

চেশায়ার বলে, তা হলে তুমি যে পথে ইচ্ছে যাও, কিছু এসে গেলনা। সোহিনী'র দুপরগুলো অনেকটা সেইরকম। কোথাও যাওয়ার নেই। সে জানে সন্ধ্যে তো হয়েই যাবে, ছেলে বর বাড়িও ফিরে আসবে। আর কোথাও পৌঁছনও যাবেনা। তাই কোন পথ কোন দিকে গেছে জেনে অ্যালিস আর কিই বা করবে। বড় হলে অ্যালিসের দুপুরগুলোও হয়ত এরমই হবে; আলসে, একলা এবং ভীষণ স্বাধীন! সোহিনী কোন মহৎ কিছুই করেনা এই সময়টায়। সে যদি কিছু করতেও চায়, তবে সেটা কিচ্ছু না করা ছাড়া আর কিচ্ছু না! এখন তার স্বামী নেই, সন্তান নেই, মা-বাবা তো এমনিই নেই! একটা দায়বদ্ধ স্বৈরাচারী রাজার দেশে একটা ছোট্ট মুক্ত আনন্দপুর, এই দুপুরগুলো।

এসব ভাবতে ভাবতেই কেমন অনায়াসে কেটে যায় তার স্বপ্নের দুপুর। আর চোখদুটো তন্দ্রায় যতই জুড়িয়ে আসে, ততই এক ভাবনা থেকে আরেক ভাবনায় তলিয়ে যেতে থাকে সোহিনী। আচ্ছা, বইটা তো পুরো দেখা হলনা তখন? ওই বড়বাবু'র স্ত্রী'র দৃষ্টি কি ফিরেছিল? বর্ষাটা চিংড়ি মাছ খুব পছন্দ করে। বাপ-ছেলে রাঁচি গেলে সোহিনী কি সংসারের টাকা থেকেই নিজেদের আনন্দ করার জন্য খরচা করবে? একা একা চিংড়ি খাবে? সকাল বেলা কাগজটা পড়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু সকালে পড়াশুনোর অভ্যেস তো সেই কবেই গেছে। থাক দুপুরেই পড়বে। সুদিন'এর মা নামটাই কি অদ্ভুত, না? সুদিন না সুধিন ওর ছেলের নাম? সত্যি কি ওরা একটা ভাল সময়ের স্বপ্ন দেখেই ওরা ছেলের নাম রেখেছিল, সুদিন? ওরাও স্বপ্ন দেখে? ওদের তো ঘরে আরো বেশি লোক, অনেক লোকের রান্না, ওদের মরদরা তো দুপুর হলেই বাড়ি ফিরে আসে? ওদেরও কি দুপুরবেলাই সব স্বাধীনতা? ওদের কি তাহলে... দুপুরগুলো... এরম... মুক্ত পাখির... চোখটা একেবারে লেগে গেছে। ভাবনা আর এগোয়েনি। সামনে আধখোলা খবরের কাগজটা উড়ছে পাখার হাওয়ায়।

হঠাৎ ফোনটা বাজে।

স্বপ্নের মধ্যে ফোনের শব্দটা অনেক দূর থেকে ভেসে আসে। বাস্তবে আসতে একটু সময় লাগে। ঘুম ভেঙে উঠে দেখে সুবীরের ফোন। রোজ অনেক আগেই ফোন করে সুবীর দুপুরের খবর নিতে। আজ ওই দেরী করেছে বলে চোখটা লেগে এসেছিল।

- হ্যালো? হ্যাঁ?

পুরো কথাটা বসে বসে শোনে সোহিনী। খুব একটা কিছু উত্তর দেয়েনা। সায়নকে স্কুলে স্পোর্টস ক্লাসে খেলতে পৈ পৈ করে বারন করে যায় সুবীর সেই ছোটবেলা থেকে। খেলোয়াড়দের অজায়গায় বেজায়গায় খেলে কোনরকম রিস্ক নেওয়াই উচিত নয়। এরম স্কুলে খেলতে গিয়ে পা'টা মচকে ফেলল

এখন কি হবে? সায়ন ফোনে ‘কিছু না কিছু না’ করছে কিন্তু স্কুলের টিচাররা বলছেন যথেষ্ট গুরুতর ওর চোটটা! ওনারা অবধি ওকে খেলতে মানা করেননা এতো করে বলার পরেও! এতো ভাল স্পোর্টসম্যান, শালা ফ্রী’তে যে করে হোক খেলা তো দেখা চাই না টিচারদের!? এখন স্কুলে সায়ন কে আনতে যাচ্ছে সুবীর। স্কুটার’টা অফিসেই রেখে আসছে। ট্যাক্সিতে ফিরবে।

- তাহলে তোমাদের রাঁচি যাওয়া?

কথাটা শোনার আগেই সুবীর ফোনটা কেটে দিয়েছে।

ফোনটা নামিয়ে রাখে সোহিনী। ছেলের জন্য খুব দুশ্চিন্তা তো হচ্ছেই। কিন্তু তার সাথে আরো কি একটা যেন হচ্ছে ওর মনের ভেতর। চুপ করে বসে থাকে অনেকক্ষণ খাটের কোণায়। কাউকে আর কোনদিনও কারনটা বলেনি। হয়তো নিজে কখনও বোঝেইনি। হয়তো বোঝার আগেই দুপুরটা শেষ হয়ে গেছিল।

কিন্তু ওর গাল বেয়ে, নীরবেই, অঝোরে ঝরেছিল চোখের জল।

অ্যালিস হয়ত পরে আবার কখনো অন্য কোন দু’মাথার মোড়ে, জেনে গেছিল কোন পথ কোন দিকে যায়। সে হয়তো আর যায়নি। সে হয়তো ফিরে এসেছিল।

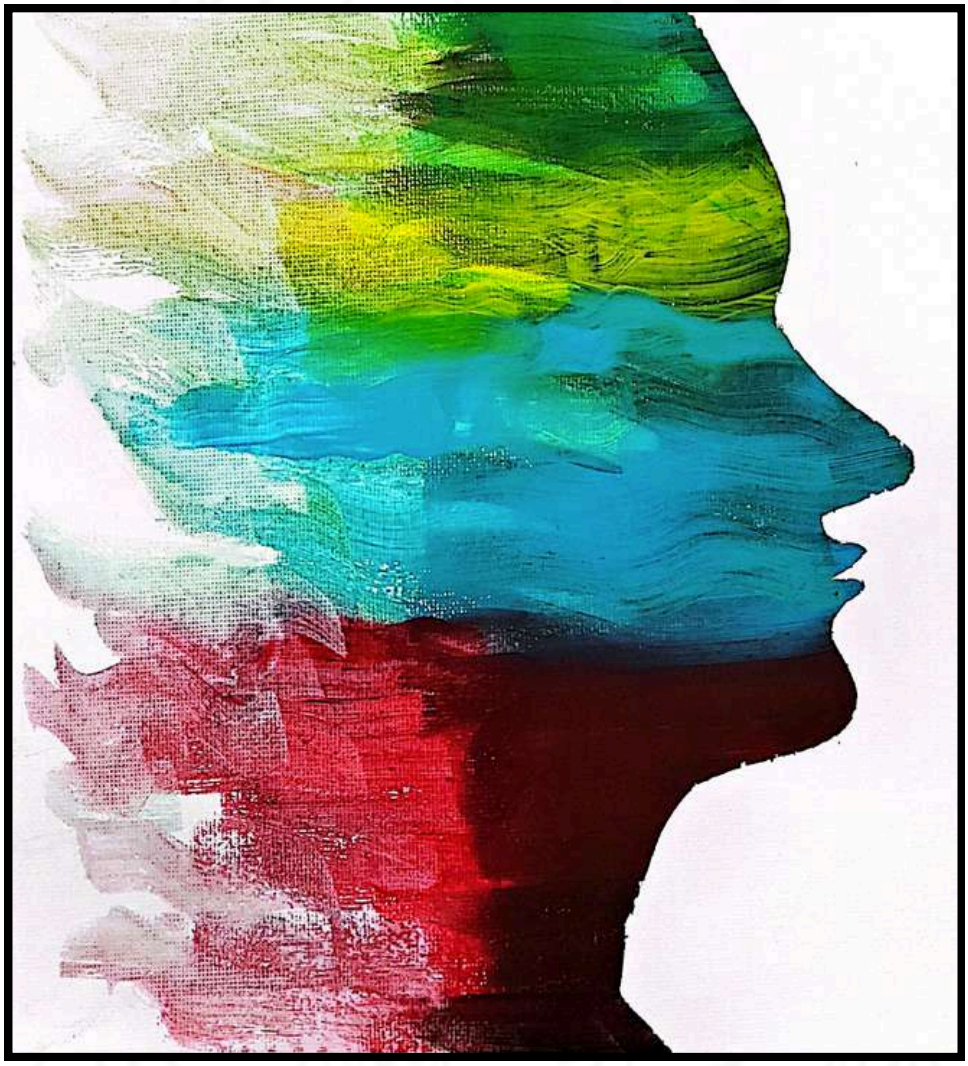

Hidden Colours - Tanmoy Sarkar [Acrylic on canvas]

Breath - Soham Ghosh [Oil on Canvas]

নারী

অনিকেত রায়

তোমার জনমে, কেউ হয় রাজা,
কেউ বা করে তোমার হত্যা;
টাকা বিনিময়ে, জোর করে হায়,
বিকেছে ঐ শরীরী সত্ত্বা।
ছোট থেকে হায়, কত রাখ-ঢাক,
না জানি কি সোনা-চাঁদি ;
বিয়ের বয়স যেই না হলো,
দাম-দরই স্বামীর দাবি ।।
পড়াশুনায় তাদের, নেই যে মানা,
চাকরিতে কিন্তু আছে ;
বেশি জানলে, বুজতে শিখলে,
স্বাধীনতা চাই পাছে।
কেউ তারে কই, ও রে মাগি,
কেউ বা রান্ডি-শালা ;
শরীরের পর, শরীর চাপে,
কইতে পারে না জ্বালা।।
লোকে বলে আজি, নষ্ট সে নারী,
নাড়ির টান যে নাই ;
ও গো নারী, কেমনে সহ্য করো,
সেটাই জানতে চাই।।

প্রতিশ্রুতি

রাজীব সরকার

তুমি যেদিন কথা রাখলে না
তুমি যেদিন পথ বদলে নিলে
যেদিন আমার উপস্থিতি অস্বীকার করলে
সেদিন আমি আঘাত পেয়েছিলাম।
সেদিন তোমার কঠিন শব্দগুলো
তরঙ্গ আকারে কানের মধ্য প্রবেশ করলো
কানের পর্দা কাঁপালও
কোষগুলিকে উদ্দীপিত করলো
তৈরি করলো ইলেক্ট্রিক্যাল বার্তা
শব্দস্নায়ু দিয়ে মগজে ঢুকলও
তোমার কঠিন শব্দগুলোর অনুবাদ করলো
সেদিন আমি হতাশ হলাম।
তীব্র আবেগে আমার
হৃদস্পন্দন বাড়লো।
হৃদয় সেদিন বোঝে নি।
আবেগের উদ্দীপনা জাগলও।
সহানুভূতিশীল স্নায়ু সক্রিয় হলও
আমি সেদিন বুঝি নি।
সত্যি আমি সেদিন বুঝি নি।
তারা ভয় পেলো
কর্টিসল ও অ্যাড্রিনালিন খরালো
রক্তচাপ বাড়ালো
হৃদস্পন্দন বাড়ালো।
সময়ের সাথে সব ঠাণ্ডা হলও
আমি সেদিন বুঝি নি।
সত্যি সেদিন বুঝি নি।
খুব কষ্ট পেলাম।
তুমি যেদিন কথা রাখলে না
তুমি যেদিন পথ বদলে নিলে
তোমার শব্দগুলো কষ্ট দিলো
সেদিন আমি আঘাত পেয়েছিলাম।

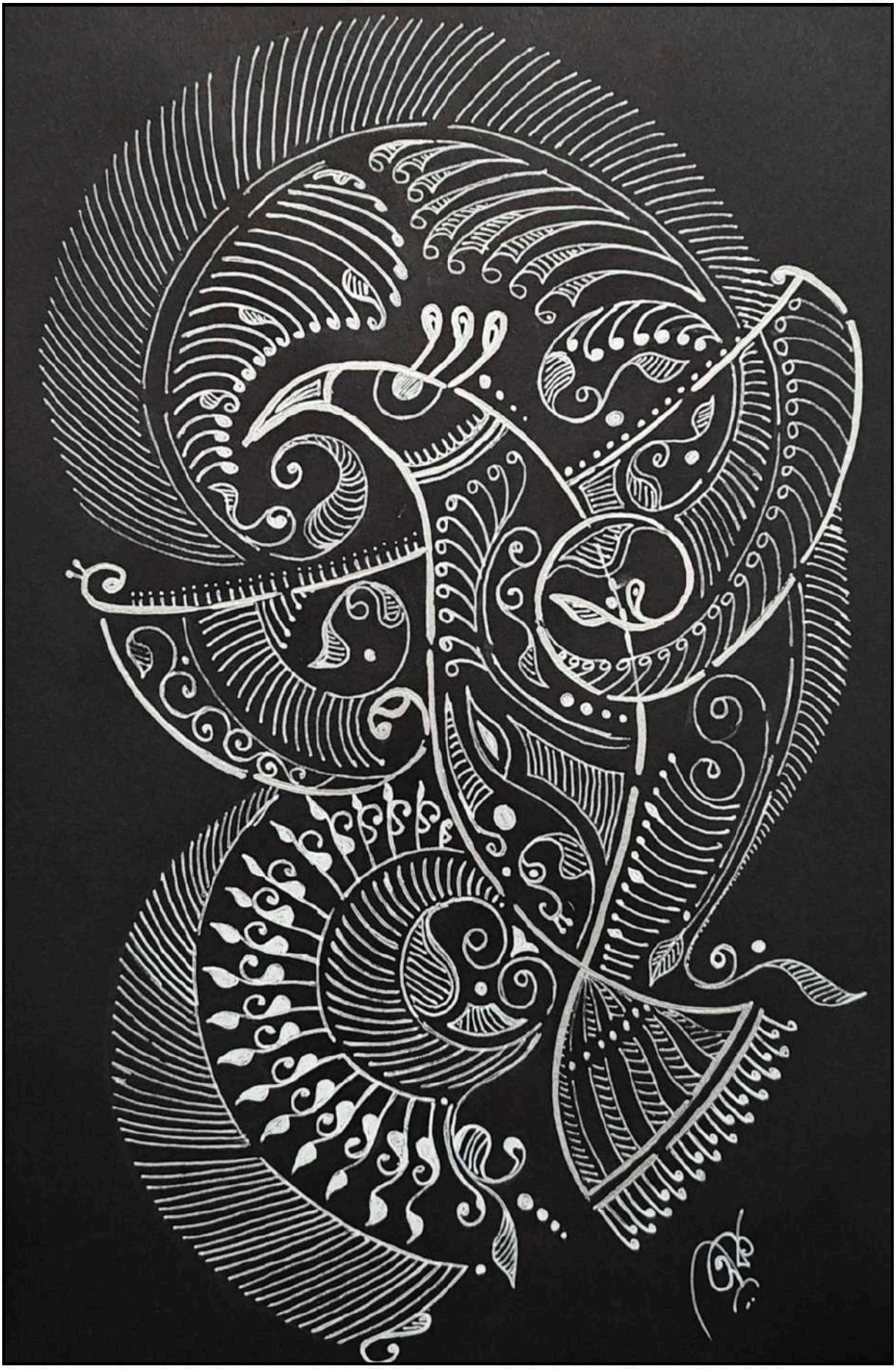

Tempered - Arka Baksi [Pen on Paper]

হেঁসেলের খাতা থেকে ভোগের লাবড়া

বৈশালী ব্যানার্জি

উপকরণ:

বেগুন - ১টা

আলু - ২টো

কুমড়ো - ১০০ গ্রাম

সিম - ১০০ গ্রাম

মিষ্টি আলু - ১টা

পটল - ২টো

ফুলকপি - ১৫০ গ্রাম

আদাবাটা - ১ চামচ

ধনে গুঁড়ো - ১ চামচ

জিরা বাটা - ১ চামচ

কাঁচালঙ্কা বাটা - ১ চামচ

সর্ষের তেল - ৪ চামচ

নুন/চিনি - স্বাদমতো

জল - পরিমাণ মতো

হলুদ - ১ টেবিল চামচ

ঘি - ১ চামচ

প্রস্তুতি প্রণালী:

প্রথমে কড়াইতে তেল গরম করে বেগুন, ফুলকপি, সিম, আলু আর পটল হালকা ভাজুন। ভাজার সময় সামান্য নুন দিন। এবার ওই তেলে পাঁচফোড়ন শুকনো লঙ্কা ভেজে নিন। তারপর তেলের মধ্যে আদা বাটা, জিরা বাটা, ধনে গড়ো, লঙ্কা বাটা আর নুন দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। মসলা থেকে তেল ছাড়লে কুমড়ো আর মিষ্টি আলু দিন। তারপর বাকি যে সবজিগুলো আগে থেকে ভেজে রাখা ছিল সেই সবজিগুলো দিন ।পাঁচ মিনিট মতো নাড়তে থাকুন। সবজি ভাজা ভাজা হলে অল্প জল দিয়ে নাড়াচাড়া করে চাপা দিয়ে ১০ মিনিট মতো রান্না করুন। সবজি সিদ্ধ হলে চিনি,ভাজা জিরের গুঁড়ো আর ঘি দিয়ে মিশিয়ে নামিয়ে নিন। গরম গরম লাবরা খিচুড়ির সাথে পরিবেশন করুন।

Abyss - Tanushree Talapatra [Lino cut]

Shiv-Shakti - Sucharita Mukherjee [Pen and Pencil on Paper]

Die Nalanda-Universität und Varanasi: Eine Reise in das alte Wissen und die Ewigkeit

Aranyasom Das

Im Dezember befand ich mich im Herzen der spirituellen Hauptstadt Indiens – Varanasi. Die Stadt empfing mich mit kühler Luft, aber die Wärme der Hingabe war an jeder Ecke zu spüren. Meine erste Station war der Heilige Tempel, wo Jahrhunderte der Gebete in den Steinmauern nachzuklingen schienen. Der Duft von Weihrauch, die rhythmischen Gesänge und der Anblick der Pilger, die sich in Ehrfurcht verneigten, gaben mir das Gefühl, als hätte sich die Zeit verlangsamtr

Vom Tempel aus schlenderte ich durch die labyrinthartigen Straßen. Sie waren voller Farben und Geräusche – safranbekleidete Sadhus, Stände voller Ringelblumen und der süße Ruf der Chai-Verkäufer. Hinter jeder Ecke verbarg sich etwas Neues: alte Türen, verblasste, aber stolze Wandmalereien und Ladenbesitzer, die mich mit einem Lächeln hereinbaten. Die Stadt wirkte wie ein lebendiges Museum, pulsierte aber gleichzeitig mit der Lebendigkeit der Gegenwart.

Meine Reise erinnerte mich auch an die Nalanda-Universität, einst ein Leuchtturm des Wissens im alten Indien. Obwohl sie weit von Varanasi entfernt liegt, fühlte sich ihr Geist des Lernens mit der zeitlosen Hingabe der Stadt verbunden. Themen wie Naturwissenschaften, Ethik und Politik sowie Kulturwissenschaften standen oberer Spitze in der Universität. Das, was einen so fesselt, ist das wie solch ein Wissen vor Tausenden Jahren schon gelehrt wurde. Des Weiterem Architektur der Gebäude wirklich atemberaubend und die Atmosphäre ist unbeschreiblich schön. Es vermittelt ein Streben nach Wissen und Geschichte. Nalanda zog einst Gelehrte aus ganz Asien an, so wie Varanasi noch immer Wahrheitssuchende anzieht Beide Orte stehen auf ihre Weise als Symbole für das beständige Erbe Indiens, der eine durch Weisheit, der andere durch Glauben.

Als die Sonne unterging, stieg ich in ein Boot auf dem Ganges. Die abendliche Puja-Zeremonie entfaltete sich wie eine heilige Aufführung. Priester schwenkten Lampen in perfektem Rhythmus, Glocken läuteten im Einklang und Gesänge stiegen in den Nachthimmel empor. Vom Wasser aus war der Anblick faszinierend: Feuer traf auf Fluss, Hingabe traf auf Ewigkeit.
Varanasi war nicht nur ein Ort, den ich besucht habe, es war eine Erfahrung, die sich für immer in meine Seele eingebrannt hat.

এমনটা কথা ছিলো না

সৌম্য তথাগত সুর

কথা ছিলো হিজল
তার খেয়ালখুশি
ঝরে পড়বে নিশীথে।
বুদ্ধ পূর্ণিমায়
হাতে হাত রেখে
সন্যাস নেব ...।
কথা ছিলো চড়ুই
খড়কুটো খেয়ে
তুমি হিমালয় ছুলে,
আমি মাথা উঁচু করে দেব হাসি।
কথা ছিলো অভিজিৎ
বিভূতির বাঁধ ভেঙ্গে নদী হব ।
তবে, এত কথায়
এমনটা কথা ছিলো না...।

অবতার

সতী মৈত্র

ভব যন্ত্রণা হতে জীবকুলেরে করিতে উদ্ধার
ধরাধামে অবতীর্ণ হন যিনি,
- তাঁরে বলি মোরা অবতার।
তাঁর তো নেই কোন অভাব -
জীবে দয়া, আচন্ডালে প্রেম বিতরনই তাঁর স্বভাব।
ক্ষুদ্রমানব মোরা - ভুলে ভরা মোদের জীবন
সংসারশোধনাগারে মোদের করিতে সংশোধন,
যুগে যুগে ভিন্ন নামে, মোদের মাঝে করেন অবতরন
এ যুগের অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ, মোরা তাঁরই কৃপাধন্য।
তিনি বিশ্ব বন্দিত, তাঁরই নামে জগৎ প্লাবিত,
হোক না যে যতই কলুষিত
তাঁর নাম জপেই হবে বিশুদ্ধ
হবে চিরতরে মুক্ত।

বিবর্তন

রাজীব সরকার

আমি তুই সবাই বদলাই।
এক জীবনে বহুবার বদলাই।
পরিবেশ বদলায় সমাজ বদলায়
এক জীবনেই কতো কিছু বদলায়।
কতোবারই বা সেখানে নিউরন বদলায়!
৯০ বছর নিউরন বাঁচে।
জিনোম সেও কি আর বদলায়!
মানুষ বদলায়।
পছন্দ বদলায়
ভালোবাসা বদলায়
আনন্দ বদলায়
স্নেহ বদলায়
বদলা বদলায়
চাওয়া পাওয়া বদলায়
৯০ বছর নিউরন বাঁচে।
কতোবারই বা সেখানে নিউরন বদলায়!
তবুও কী তোর জিনোম বদলায়!
যেদিন ভালোবাসলি
কথা দিলি
যেদিন ভালো বাসতে ভুললি
কথা ভাংলি।
সেদিনও ছিলো একই নিউরন
সেদিনও ছিলো একই জিনোম।
তুই চলে গেলি ভাবলি
কিছুই নয় রিপ্লেসেবেল
হ্যাঁ তাই,
নাথিং রিপ্লেসেবেল
তবু জীবন চলে
তাল হারিয়ে আবার নতুন তালে।
সেদিনও ছিলো একই নিউরন
সেদিনও ছিলো একই জিনোম।

Companionship - Kazi Rafsanjani Amin

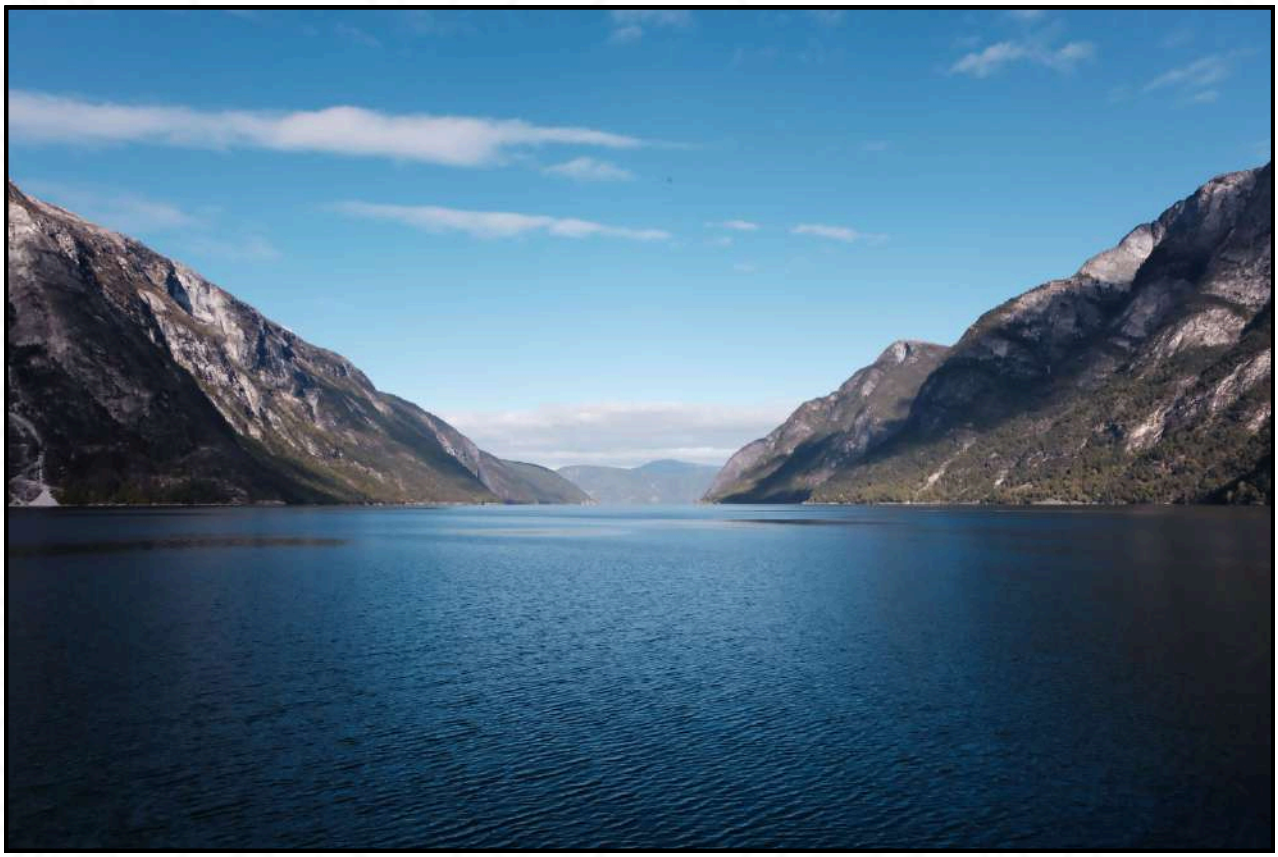

Tranquility - Jyotirmoy Paul

"লাইক, শেয়ার আর সময়ের মৃত্যু!"

প্রলয় তারণ দাস

বাস্তব জীবনের প্রেক্ষাপট: তুমি জানো না, কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া জানে তুমি কখন বিরক্ত, কখন খুশি, আর কখন চায় নিজের জীবনটা অন্যের সঙ্গে তুলনা করতে। ইনস্টাগ্রামের অ্যালগোরিদম একদম বন্ধু নয়, বরং এক অদৃশ্য সময় চুরির মাস্টারমাইন্ড। এক গবেষণায় দেখা গেছে[১], বেশি ফেসবুক স্ক্রল করা মানে মুডে -০.২১ এর প্রভাব, অর্থাৎ "তুমি এখন কম খুশি।" অদ্ভুত, তাই না? কিন্তু আমরা সবাই জানি যে, কম খুশি হয়ে মনমরা থাকার বদলে, লাইক, ইমোজি আর কমেন্ট তো আছেই, মনস্তাত্বিক খুশি (*virtual-mental* হ্যাপিনেস) প্রকাশ করার জন্য! যদি এই খুশিকে একটু বিজ্ঞানসম্মত ভাবে প্রকাশ করতে চাই, তবে দেখো নিচের চিত্রটা-

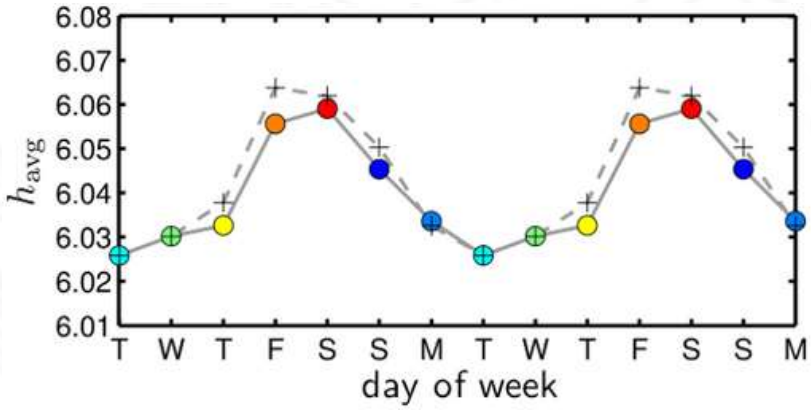

চিত্র ১. সপ্তাহের দিনের ফাংশন হিসাবে মানুষের গড় সুখ (সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার)। লেখচিত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে যে শুক্রবার, শনিবার ও রবিবারে মানুষের সুখী ইনডেক্স(h_{avg}) বাড়তে বাড়তে চূড়াতে পৌঁছায় আবার সপ্তাহ শুরু হলেই h_{avg}কমতে থাকে। এই ডাটা গুলো নেওয়া হয়েছে মানুষের টুইট এর সংখ্যার উপর ভিত্তি করে (মে মাসের শেষ দুই সপ্তাহ, ২০০৯)। আরো জানতে Dodds *et. al.*[২] এর গবেষণা পত্রটি পড়তে পারেন। এই লেখচিত্রটি ওনাদের লেখা গবেষণা পত্রের ৫ নম্বর চিত্র।এই সুখ কিন্তু আবার বস্তুবাদী (materialistic)[*যদিও বস্তুবাদী সম্পদ সাময়িক আনন্দ বা তৃপ্তি প্রদান করতে পারে (Hedonic Happiness), তবুও এর মাধ্যমে Intellectual অথবা spiritual বা দীর্ঘস্থায়ী সুখের সাধনা (pursuit of Eudaimonic happiness)করা বেশ কঠিন]।

আমরা (জেন Y/Z) এইসব তত্ত্বিবা পরীক্ষালব্ধ কথাকে- মজার মোড়কে হালকা করে নিয়ে ডিজিটাল স্ক্রীন বকলমে সামাজিক মাধ্যমগুলোর প্রভাব কে উপেক্ষা করতে চাই।মনে মনে এই অদ্ভুত কাল্পনিক-বাস্তবতাকে (virtual-reality/VR) কে উপলব্ধি করি, কিন্তু তারপরও আমরা প্রতিদিন ২ ঘণ্টা আরও স্ক্রল করি,কারণ মস্তিষ্কের ইনস্টাগ্রাম অ্যালগোরিদম রেসিপি বলে "তুমি যদি এক মিনিট থামো, আমরা তোমার আনন্দে হস্তক্ষেপ করব।" এটা আমাদের ভাবায় সেই বিড়ালের পরজীবী Toxoplasma gondii বা arthropod পরজীবী Horsehairworm দের কথা, বাস্তবিকই কি মানবজীবনে তাই ঘটছে— চলো দেখা যাক একটু বিজ্ঞানের আলোচনার মোড়কে।

প্রারম্ভিক দৃশ্য: প্রোডাক্টিভিটির মরীচিকা

প্রলয়ের সকাল শুরু হয় কফির কাপ হাতে এক মহৎ সংকল্প (determination) নিয়ে: "আজই জীবন বদলে দেব!" টাস্ক লিস্ট, পোমোডোরো টাইমার, মেডিটেশন অ্যাপ—সব প্রস্তুত। কিন্তু তার "প্রোডাক্টিভিটি পার্টনার" স্মার্টফোনটি তখন চুপিচুপি হাসছে। কারণ, স্ট্যাটিস্টা ২০২৫-এর ডেটা বলছে: গড়ে মানুষ দিনে ১৪১ মিনিট (প্রায় ২.৩৫ ঘণ্টা) সোশ্যাল মিডিয়ায় কাটায়[৩]। প্রলয় ভাবে,"আমি তো গড়ের চেয়ে কম!" এটাই প্রথম ভুল।প্রলয় স্ক্রল শুরু করল সাথে নিয়ে এক ভাঙা প্রতিশ্রুতি: "শুধু এক মিনিট"। স্ক্রল শুরু করতেই প্রথম পোস্ট: বন্ধুর ইউরোপ ভ্রমণের স্টোরি। আরে! এটা তো মনে হচ্ছে লন্ডনের সেই ঐতিহাসিক বিগ-বেন আর পাশে টেমস, এটা গ্রিসের বিখ্যাত

নীল-সাদা চোখজুড়ানো সান্তরিনী, বা এটা তো জেনেভার লেকের নয়নাভিরাম দৃশ্য অথবা ইটালিয়ান ডলোমাইটস বিস্ময়, পর পর লাইক দিতে গিয়ে প্রলয়ের মস্তিষ্কে তখন ডোপামিনের হালকা ঝিলিক[৩]। দ্বিতীয় বা তৃতীয় পোস্টে সেরকম কোনো লাইক নেই— অবাক হলেও আরো এগোলো। এই লাইক-চক্রটা আসলে কোনও জাদু নয়; এটি আচরণবিজ্ঞানর প্রাচীন কৌশল, খুব চেনা জানা মনোবৈজ্ঞানিক "ভেরিয়েবল-রেশিও" রিওয়ার্ড শিডিউলের আধুনিক সাজে মোড়ানো—বলা যায় নতুন বোতলে পুরোনো মদ।শুরুতেই জেনে নাও, তুমি একা নও—প্রলয় নয়। আমরা সবাই চাই ছোট ছোট পুরস্কার: লাইক, কমেন্ট, শেয়ার—এই ছোট চাহিদাগুলোই ধীরে ধীরে আমাদের মনকে বদলে দেয়।

বি.এফ. স্কিনার কবে বলেছিলেন —অনির্দিষ্ট, হঠাৎ পাওয়া পুরস্কার (যেমন স্লট মেশিনে বড় জ্যাকপট না হলেও মাঝে মাঝে ছোট জয়), আমাদের আচরণকে সবচেয়ে বেশি টিকিয়ে রাখে।[৪] সোশ্যাল মিডিয়া হলো সেই অপূর্ব সম্ভাব্যতা— বন্ধুবান্ধবের 'লাইক বা কমেন্ট'-এর চিরন্তন প্রত্যাশা; কখন লাইক আসবে, কতটুকু প্রশংসা হবে, সেটা না জানা। প্রলয় আর থামতে পারছে না, মনে একটা চাপা অস্বস্তি কাজ করছে।[৫] সোশ্যাল মিডিয়াতে তখন সৃষ্টি-সুখ উল্লাসের ঝংকার, যেখানে অ্যালগোরিদম হলো এই তত্ত্বের আধুনিক জল্লাদ এবং ব্যবসা হলো 'মনোযোগ বিক্রী করা!'

গাণিতিক ট্র্যাজেডি: "কত স্ক্রলে হবে একটা লাইক?"

ধরা যাক, প্রতিটি স্ক্রলে লাইক পাবার সম্ভাবনা p=০.০২ (২%)। জ্যামিতিক বন্টন বলে: প্রথম সাফল্য পেতে গড়ে প্রয়োজন $E[N] = 1/p$ = ৫০ স্ক্রল! প্রলয় হিসাব কষে: "মাত্র ৫০ স্ক্রলেই তো জনপ্রিয় হওয়া যায়! আমি যত স্ক্রল করবো অন্যদের কাছেও আমার রিচ আউট বাড়বে আর আমার পোস্টের লাইক পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে"। বাস্তবতা: ৫০ স্ক্রল = ৩০ মিনিট, কম নয় কিন্তু যা সময় আর মনোযোগ দুই কাড়ে সঙ্গে নিজের কন্টেন্ট ক্রিয়েশন এর সময় কমায়। কিন্তু পোস্টে লাইক পেলেই ডোপামিনের নেশা (*temporal pleasure*) বাড়ে, আরও ৫০ স্ক্রলের দিকে ধাবিত হয়।

স্ক্রল সংখ্যা (N)	লাইক পাবার সম্ভাবনা	ডোপামিন লেভেল
১০	১৮%	↑
৫০	৬৩%	↑↑
১০০	৮৭%	↑↑↑

চিত্র ২. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে লাইক পাওয়ার সম্ভাবনা।

কিন্তু এই লাইক যাত্রার পিছনে আছে ডোপামিনের ভয়াবহ ইকোসিস্টেম। মস্তিষ্ক আমাদেরকে পুরস্কারের দিকে টেনে নিয়ে যায়; পুরস্কার-প্রত্যাশা ও পুরস্কার-প্রাপ্তির মধ্যে যে তফাত, সেটাই ডোপামিন-সিগন্যাল। সহজ করে বললে— যখন কোন পুরস্কার অপ্রত্যাশিত ভাবে আসে, সেখানেই হয় ডোপামিনের বিস্ফোরণ ⬆️; যখন পুরস্কার ভবিষ্যদ্বাণীমতো হয়, ডোপামিন সিগন্যাল হয় স্থিতিশীল ⬇️, এটাই শেখার ভিত্তি। শুল্টজ ও সহকর্মী এই রিওয়ার্ড-প্রেডিকশন-এরর ধারণা ভালোভাবে দেখিয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়া ঠিক এই আচরণগত সূত্রকে (*prediction error*) কাজে লাগায়: কখনও হাজার লাইক, কখনও শূন্য, এই অনিশ্চয়তাই প্রলয়কে আটকে রাখে।[৬] প্রলয় ভাবে, তাহলে আমি কি সময় উপযোগী পোস্ট দিতে পারছি না, আমার কি ক্রিয়েটিভিটি কম হচ্ছে, তখন সে আরো বেশি কন্টেন্ট দেখতে শুরু করে নতুন কিছু দেখার আশায় আর সঙ্গে সঙ্গে আবারো ডোপামিনের বিস্ফোরণ। গ্যালাক্সি ঘুরছে, তারা ঘুরছে, পৃথিবী ঘুরছে, আমি ঘুরছি, তুমি ঘুরছ, তাহলে কি ইউনিভার্স

ও ঘুরছে আর মাল্টি-ভার্স এর কি খবর? শুরু, শেষ যদি একই আদি-অন্ত হয়, সেখানে আমি একটু স্ক্রল করলেই বা ক্ষতি কি? প্রলয় ভাবছে প্রচুর কাজ হচ্ছে, ফিজিক্স বলছে স্থানান্তর নেই, তাই কাজ শূন্য! এবার সত্যিই মাথা বনবন করছে!

এখন একটু বাস্তব-মানুষিক ফলাফল: দীর্ঘমেয়াদি পর্যালোচনায় দেখা গেছে, ফেইসবুকের বা ইনস্টাগ্রামের মতো প্ল্যাটফর্ম বেশি ব্যবহার করলে সাবজেক্টিভ ওয়েল-বিয়িং কমে যেতে পারে, তার সাথে মানসিকতা ও জীবন-সন্তুষ্টি নেমে আসে। আর সেটা শুধু গল্প নয়, দৈনন্দিন তথ্য-ভিত্তিক গবেষণাও এটাকেই তুলে ধরছে। গবেষণা প্রমাণ করে: ফেসবুক ব্যবহার মানসিক সুস্থতার সাথে নেতিবাচক সম্পর্কযুক্ত- প্রতি ১০০ টা স্ক্রলে ২১% সুখ উধাও। অর্থাৎ, লাইক বাড়ে, জীবনযাত্রার মান কমে![১]

প্রলয় রাত ২টায় ভাবে: "শুধু একটা রিল!" রাত দুটো বাজল, তিনটে বাজল ---কিন্তু সে ফোন বন্ধ করল না। সকালে ঘুমের জন্য চোখ দুটো ভারী, লাল লাল চোখ, সারাদিন ঘুম কম, কর্মক্ষমতা নষ্ট, এটা শুধু কথার কথা নয়, প্রমাণিত সত্য[৭,৮]। এটা কি ইচ্ছাকৃত অভ্যাস, না গণিতের ফাঁদ? কারণ তত্ত্ব বলে, আমাদের ইলেকট্রনিক ডিভাইসের বিকিরণ, বিশেষ করে রাতের আলো (*light-emitting screens*) মেলাটোনিন নিঃসরণ কমায়, ঘুম আসে দেরী করে এবং সার্কেডিয়ান ক্লককে (ঘুমের সাইকেল) পিছিয়ে দেয় আর পরের দিন অ্যালার্টনেস কমায়। ক্লিনিক্যাল পর্যায়ের বিশ্লেষণও দেখায় বেশি সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার-করা মানুষদের মধ্যে ঘুমের ব্যাঘাতের ঝুঁকি বেশি। প্রলয় যা পেয়েছে তা হলো রঙিন, স্বপ্নীল, ও কাল্পনিক (ভার্চুয়াল) স্রোতে হারানো রাত আর দিনব্যাপী ক্লান্তি। যদি বলি সে যে শিখছে অনেককিছু তার বেলা, মনে প্রশ্ন আসে আচরণগত অর্থনীতি (*Behavioral Economics*) কি বলে? ভাবো, ভাবো, ভাবা প্র্যাকটিস করো।

বড় প্রশ্ন: কিন্তু, অ্যালগোরিদম ঠিক কিভাবে আমাদের দুর্বলতাকে শোষণ করে? বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই অ্যালগোরিদমগুলোর লক্ষ্য হলো: ইউজারের মনোযোগ যত বেশি সম্ভব ধরে রাখা, কারন বিজ্ঞাপন-টাইমই অর্থ। তারা ক্যালিব্রেট করে কি কন্টেন্টে তুমি লম্বা সময় থাকো, কোন ধরনের পোস্টে কমেন্ট করে উত্তেজনা পাও, কোন সময়ে তুমি সচেতনভাবে 'ভুলে যাও' তোমার রিমাইন্ডার। অলসতা, কৌতূহল, নিরসতা, *FOMO*(*Fear of Missing Out*) এসব মানসিক অবস্থাই তাদের নির্বাচনী লক্ষ্য। তাই আমাদের নতুনত্বের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে অ্যালগোরিদম কনটেন্ট দেয় যাতে ছোট রিওয়ার্ড-রিইনফোর্সমেন্ট হয় এবং পরে আরেকবার ভিন্ন ধরণের পুরস্কার দিয়ে রাখে, এক কথায় মানসিক পিং-পং খেলা চলছে খুব স্ট্রাটেজিক ভাবে। দেখা যাচ্ছে ছিল রুমাল, হয়ে গেলো বিড়াল। এবার এই মোটা লাল বিড়ালটা কিসব আবোল-তাবোল বকছে অ্যালগোরিদম নিয়ে, সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করো, শুধু ওই বিড়ালের মুখ চেয়ে। জাস্ট একবার! বলছে, আমাদের এই শেখার প্রক্রিয়াটি রিসকোরলা-ওয়াগনার (*Rescorla–Wagner*)[৯,১০] মডেলের ভাবনার সঙ্গে মিল আছে:সিস্টেম ক্রমশ শেখে কোন সিগন্যাল(নোটিফিকেশন, লাইক, শেয়ার)বেশি পূর্বাভাস-যোগ্য পুরস্কার বয়ে আনবে এবং সেটার *associative strength* বাড়ায় কালক্রমে; নতুন, অপ্রত্যাশিত কনটেন্ট বড় *prediction error* সৃষ্টি করে, আর আমরা আরো স্ক্রল করি। গাণিতিকভাবে এই মডেলকে সংক্ষেপে লেখা যায়:

নতুন শক্তি = শেখার গতি × কন্টেন্টের আকর্ষণ × (প্রাপ্ত পুরস্কার –প্রত্যাশিত পুরস্কার)

গাণিতিক সমীকরণ: $\Delta V = \alpha \times \beta \times (\lambda - V)$ (১)

ΔV = মস্তিষ্কে শেখার পরিমাণ (কতটা আটকে যাবে?), α = শেখার গতি (তুমি কত দ্রুত আসক্ত হচ্ছ?), β = কন্টেন্টের আকর্ষণ (ভিডিও/ছবি কতটা মজার?), λ = প্রাপ্ত পুরস্কার (লাইক/শেয়ার/নোটিফিকেশন), V = প্রত্যাশিত পুরস্কার (তুমি যা আশা করেছিলে)

কাজ করে কীভাবে?

১. প্রথম স্ক্রল: যেমন ধরা যাক প্রলয় লাইক আশা করেছিলো: ১০ লাইক (V = ১০), সে পেলো: ২ লাইক (λ = ২), তাহলে ফলাফল: $\lambda - V$ = ২ -১০ = -৮ (নেগেটিভ শক!) → প্রলয় এর মাথাতে আলগরিদম সংকেত পাঠালো "আবার চেষ্টা কর !"

২. পরের স্ক্রল: এবার প্রলয় হঠাৎ করে পেলো ৫০ লাইক (λ = ৫০)! প্রত্যাশা ছিল ৫ (V = ৫), ফলাফল: ৫০ – ৫ = +৪৫ (অপ্রত্যাশিত ডোপামিন বিস্ফোরণ!) → এবারও নির্দেশ এলো "আরও স্ক্রল !"

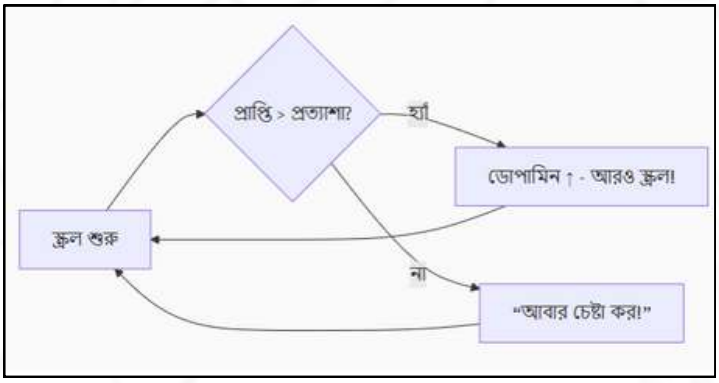

৩. চক্র (প্রলয় যে ফাঁদে আটকা পড়েছে) বাস্তব উদাহরণ : ইউটিউব : "AUTO PLAY" বাটন → B (কন্টেন্টের আকর্ষণ) অসীম করে। ইনস্টাগ্রাম : "আরও দেখুন" সাজেশন → A (শেখার গতি) বাড়ায়। ফেসবুক বা মেটার: নোটিফিকেশন → (Λ – V) পুরস্কারের-প্রত্যাশার ফারাক তৈরি করে।[১১]

মনে রেখো এটা শুধু গড়; কখনও কম বা বেশি হতে পারে (*variance* বড়)। “৫০ স্ক্রল” প্রতিপাদ্যতে: তুমি দ্রুত একবার সাফল্য পেলে ভেবে নিতে পারো যে পরিস্থিতি তোমার পক্ষে— কিন্তু “জনপ্রিয়তা” পেতে হলে একবারের লাইকই যথেষ্ট নয়; ধারাবাহিক এনগেজমেন্ট, শেয়ার ও রিচ দরকার।

দূর, এইসবে খেয়েদেয়ে ‘*Me Time*’ এ বসে একটু নিজেকে হালকা করতে চাই, আর কোথাকার কোন প্রলয় এসে ঘুমের পিন্ডি চটকাচ্ছে, আর আমার এই সাজানো মাথাতে ফালতু কিছু ইকুয়েশন ঢোকাচ্ছে। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর সময় পেলো না, যত্তসব।প্লীজ, প্রলয় কে এখনই থামিও না, বেচারা ১ বছর হাপিত্যেশ করে বসেছিল কবে বঙ্গ–শারদীয়া তে লেখা দেবে বলে, তাই আর একটু কষ্ট করে ২-৪ লাইন পড়। কথা দিচ্ছি, শেষে খুব মজা আছে।

যেটা বলছিলাম, তাছাড়াও আমাদের *FOMO* নামে যেই মৌলিক অনুভূতিটা আছে, সেটা শুধু ‘সোশ্যাল’ নয়, বরং গভীরভাবে মোবাইল-সিস্টেম দ্বারা উস্কানিমূলক। *FOMO* একটা ভয়াবহ মস্তিষ্কের প্রোডাক্ট, যা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার এবং পরীক্ষামূলক লুপ বাড়ায়। *FOMO*-স্কোর এবং সোশ্যাল-মিডিয়া-এনগেজমেন্টের মধ্যে গভীর সম্পর্ক (*positive correlation*) দেখা গেছে, তাই তুমি যখন ভাবো “আরে, কি হচ্ছে না দেখে গেলে তো আমি কিছু মিস করব”—ঠিক তাই হচ্ছে। *Przybylski et al.* (2013)-এর গবেষণা বলছে: *FOMO* থাকলে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার ৩৪% বাড়ে।[১২] ব্যবসা বাড়ছে, টাকা হচ্ছে (সত্যিই কি!), ঘুম কমছে আর দিনরাত এক হয়ে স্বপ্ন-বাস্তবের সুইচিং হচ্ছে! দারুন মজা হচ্ছে। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ালো, আজকের সমাজে নেশা শুধুই আসক্তি নয়, উপভোগ্যও। শাবাশ, কিন্তু এই নেশা ছাড়ানোর বিজ্ঞাপন তো সংবাদপত্রের *page*2 তে তো থাকে

না, কোনো জ্যোতিষীও বিজ্ঞাপন দেন না ১০০% নেশা ছাড়ান, বিফলে মূল্য ফেরৎ। প্রলয়ের মনে প্রশ্ন, এই নেশায় আসক্ত হলে ছাড়াবে কে? আহারে, এত ভাবো কেনো বাবুসোনা, সমাধান তো আছেই গানে 'কেউ জানে না, কেউ জানে না, মন জানে।' ওদিকে মন বলে, জাস্ট চিল, চিল, সমাধান আছে এবং তা বিজ্ঞানসম্মত।

· **নোটিফিকেশন-চিকিৎসা:** শুধু প্রয়োজনীয় অ্যাপের নোটিফিকেশন রাখো; বাকি সব 'চুপ'। এলগোরিদম তোমাকে চেনার আগেই ডুব দিয়ে অদৃশ্য হও। রচ চুপচাপ রূপকথা, করো প্রশ্ন নীল ধ্রুবতারা কে,"সখী, ভালবাসা কারে কয়! সে কি কেবলই যাতনাময়।" বাহহ, বেশ একটা লিরিক্যাল ভাব আসছে তো। মিউজিক থেরাপি খুব সুন্দর হয়, শুনেছে অনেক, আজ প্রলয় অনুভব করলো প্রথম।

· **স্ক্রল-বাউন্ডারি:** প্রতিদিন সোশ্যাল-সময় T_{max} সেট করো = ৩0 মিনিট। টাইমার বাজলে সচেতন হও।সেই ভেবে প্রলয় ডাউনলোড করে স্ক্রিন টাইম ট্র্যাকার। তারপর এলো নোটিফিকেশন: "আজ ৪ ঘণ্টা স্ক্রলকরেছেন!" সঙ্গে সঙ্গে শেয়ার করে: "আমি এখন প্রোডাক্টিভ!"তার পরপরই ফেসবুক নোটিফিকেশন: 'শর্মিলা তোমার স্টোরি দেখেছে!' প্রলয়ের তখনকার অবস্থা হলো উপরের সমীকরণের আলফা (α), আর নিজেই আবার স্ক্রলে ঢুকে গেলো । এটাই তো অ্যালগোরিদমের জয়! খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে।

· **রাতের রুটিনে ডিভাইস-বাঁধা:** শোবার এক ঘণ্টা আগে ফোন রেখে দাও অন্য রুমে; যদি বোর হয়ে যাও প্ল্যান-*B* (বই পড়া) বেশ কার্যকর। *Chang et al.* দেখিয়েছেনএই অভ্যাস ঘুম উন্নত করে।[৮]এত দেখছি না পাড়াতে, না ক্লাবে, জাস্ট ঘরেতে বসেই সমাধান,ওহহ, লাভলি!

· **JOMO অনুশীলন:** *Joy Of Missing Out* -অল্প হলেও বেছে নাও, যেকাজে মন বসে। পুরুষ(চেতনা)ও প্রকৃতিকে মেলাও, ওরাই আসল শিক্ষক।মন শহরে বা নগরে না বসলে, চলে যাও সাগরে। দেখবে কেমন মাতাল মাতাল লাগে। চেতনার রঙে নিজেকে রাঙানোর আগে প্রলয় ভাবে, চলো একদান লুডোই খেলি।😊

গল্প শেষ? না, না, এটা শুরু। চলো শুনি একটু পয়া-লাইক ছন্দে।

শুনো শুনো গুণীজন, শুনহ মন দিয়া—
কই অর্বাচীন কথন, সোশ্যাল মিডিয়া নিয়া।
প্রলয় কফির গরমে, সুর বেঁধে বলিল ভোরবেলায়,
পুরনো খাতা, ল্যাপটপ খুলি— মজি গানগাথায়,
"সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি—
সারা দিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি"।
ভাবিয়া করি কাজ, শেষে খুলি মুঠোফোন,
কভু ভুলি না ছলায়, শপথ রাখিব ততখন।
ফোন বাবাজি অন্তরালে চাপায়ে কান,
মিটিমিটি হাসে, লুকায়ে মিথ্যা অভিমান—
ওগো প্রিয়জন, তোমারি তো আমি—
ঘর–সংসার, জগত সব খবরেই ভ্রমি!

সকলে উঠিনু হেসে, বলি— এ কি আলাপন
লাইক, কমেন্ট অদর্শনে, বাঁচিবে কিএ জীবন!
পিংপিং করে"একটি লাইক এলো, একটুকু ছোঁওয়া লাগে!"
কান চাপিয়া, মাথা দোলায়া প্রলয়, তব জয়গাথা মাগে!
"ওহ! মাত্র বারোটা স্ক্রল আজি"— বিজয়ী তুমি, এসো মমদ্বারে।
Tap, *Swipe* বিনা জয়ী করে, মোরে বাঁধো বারেবারে।
পাঁচালীর তালে তালে, কফি-কথা-ফোনের মিষ্টি নাটিকা বাজে,
প্রতিজ্ঞার পাতা খুলে রাখা— ফাঁকি দিয়ে যায় দিনের সাজে—
প্রলয় ভাবে আমি জয়ী, স্ক্রীন ভাবে আমি—
ডেটা বলে আমি জয়ী, হাসেন অন্তর্যামী।

মানে দাঁড়ালো "স্ক্রিন টাইম ট্র্যাক করা = মদের বোতলে ক্যালোরি মাপা! আসল সমস্যা— 'আচরণগত আসক্তি (*Behavioral Addiction*)' কে এড়িয়ে যাওয়া। ভুললে চলবে না, অ্যালগোরিদম কাজ করে নিরন্তর, পথে-প্রান্তরে, নগর-বন্দরে, বাড়ি-বাজারে।

পরিশেষে, সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের "সময়ের মৃত্যু" ডেকে আনে, যেখানে প্রতিটি লাইক আসলে মানুষের আত্মার কবর খোঁড়ার শব্দ । প্রলয় আজ শুধু ১২টি স্ক্রল করলেও... কাল আবারও সেই ফাঁদেই পা দেবে! কারণ, "একটা ভিডিও/ রিল শুধু" -এই কথার মধ্যেই লুকিয়ে আছে অনন্ত আত্মসমর্পণ ।

নিচে রইলো তার কাজের মেকানিজম (গাণিতিক সত্য):

প্রলয় বা তোমাদের কাজ	ফলাফল	বৈজ্ঞানিক কারণ
বেশি স্ক্রল করা	শুধুই **সময় নষ্ট**	ডোপামিন লুপে আটকানো (Schultz, 1997)৬
অন্যদের পোস্টে লাইক	তাদের **লাইক বাড়ে**	রেসিপ্রোসিটি বায়াস (Cialdini, 1984) ১৩
নিজের ভালো কন্টেন্ট পোস্ট	নিজের **লাইক বাড়তে পারে**	অ্যালগোরিদমিক রিলেভ্যান্স (মেটা, ২০২৩)১৪

· ✅ লাইক চাইলে? অন্যদের পোস্টে অর্থপূর্ণ কমেন্ট দাও (এনগেজমেন্ট ৩*x* বাড়ে) "বিড়ালছানার ভিডিওতে 'কিউট' লিখলে লাইক মিলবে না"- 'এই বিড়ালটা তো আমার অফিসের বসের মতো!' লেখ! কথা দিচ্ছি, লাইকের বন্যা বয়ে যাবে, তখন নিজেই নিজেকে সামলাতে পারব না, গোছানো তো পরের কথা।[১১]

❌ বেশি স্ক্রল করলে? শুধু অ্যালগরিদমের এড রেভেনিউ বাড়ে — তোমার নয়।"ঘন্টার পর ঘন্টা রিলস দেখে তুমি 'কন্টেন্ট ক্রিয়েটর' নও- 'কন্টেন্ট কনজিউমার'!" আর ঠিক তখনই বিষণ্নতা মাখানো মায়াবী লাল চোখে বলতে ইচ্ছে করে—

"আমি বলছি না ভালোবাসতেই হবে, আমি চাই
কেউ একজন ভেতর থেকে আমার ঘরের দরোজা
খুলে দিক। কেউ আমাকে কিছু খেতে বলুক।

কাম-বাসনার সঙ্গী না হোক, কেউ অন্তত আমাকে
জিজ্ঞেস করুকঃ "তোমার চোখ এতো লাল কেন?"[১৫]

কে বলতে পারে, প্রলয় এই আধুনিক '*The Truman Show*' এর কোনো এক অভিনেতা নয়! অথবা, সে হয়তো নিজেই গ্রীক পুরাণের *Neostoicism* এর অংশ!তাহলে, কি আমরা সোশ্যাল মিডিয়া তে থাকবো না, থাকবো না আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায়? ধূর পাগলা(পাগলি), জানিস না, সবই মায়া! "ওঁ নমঃ সহায়"।

পরিশিষ্ট: পাঠক সম্বন্ধে একটি স্বীকারোক্তি: এই গল্পে আপনাদের "তুমি", "তোমরা" সম্বোধন করা হয়েছে কোনও অনভিপ্রেত ঔদ্ধত্য বা অনাধিকার চর্চার জন্য নয়। বরং, ডিজিটাল যুগের এই যৌথ সংগ্রামে আমরা সকলেই একই নৌকোর যাত্রী — প্রলয়, আমি, আপনি, তোমরা। "তুমি" সম্বোধনটি এখানে আন্তরিকতার ছোঁয়া দিতে,দূরত্ব ঘোচাতে এবং গল্পকে জীবন্ত করতে ব্যবহৃত হয়েছে। যদি অস্বস্তি হয়, ক্ষমাপ্রার্থী!

১. Kross et al., Facebook Use Predicts Declines in Subjective Well-Being in Young Adults, PLOS ONE (2013).

২. P. Dodds et al. Temporal Patterns of Happiness and Information in a Global Social Network: Hedonometrics and Twitter, PLOS ONE (2011).

৩.https://electroiq.com/stats/average-time-spent-on-social-media/

৪. Skinner, B. F. (1953). Science and human behavior. Macmillan.

৫. https://courses.lumenlearning.com/waymaker-psychology/chapter/reading-reinforcement-schedules/

৬. Schultz et al. A Neural Substrate of Prediction and Reward, Science (1997).

৭. Levenson et al., The Association between Social Media Use and Sleep Disturbance among Young Adults Prev. Med. (2016).

৮. Chang et al., Evening use of light-emitting eReaders negatively affects sleep, circadian timing, and next-morning alertness, PNAS (2015).

৯. Rescorla, R.A. & Wagner, A.R. (1972) A theory of Pavlovian conditioning: Variations in the effectiveness of reinforcement and nonreinforcement, Classical Conditioning II, A.H. Black & W.F. Prokasy, Eds., pp. 64–99. Appleton-Century-Crofts.

১০. https://en.wikipedia.org/wiki/Rescorla%E2%80%93Wagner_model?utm_source

১১. OpenAI. (2025). ChatGPT. https://chat.openai.co, Deepseek. https://www.deepseek.com/

১২. Przybylski et al., Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out, Computers in Human behavior (2013).

১৩. Cialdini, R. (1993). Influence. The Psychology of Persuasion. William Morrow e Company, 1984.ISBN 0688128165

১৪. 2023 Facebook Algorithm Guide: Overview & Best Practices [https://tinuiti.com/blog/paid-social/facebook-algorithm/]

১৫. গুণ,নির্মলেন্দু তোমার চোখ এতো লাল কেন?,নির্বাচিতা(১৯৮৩)

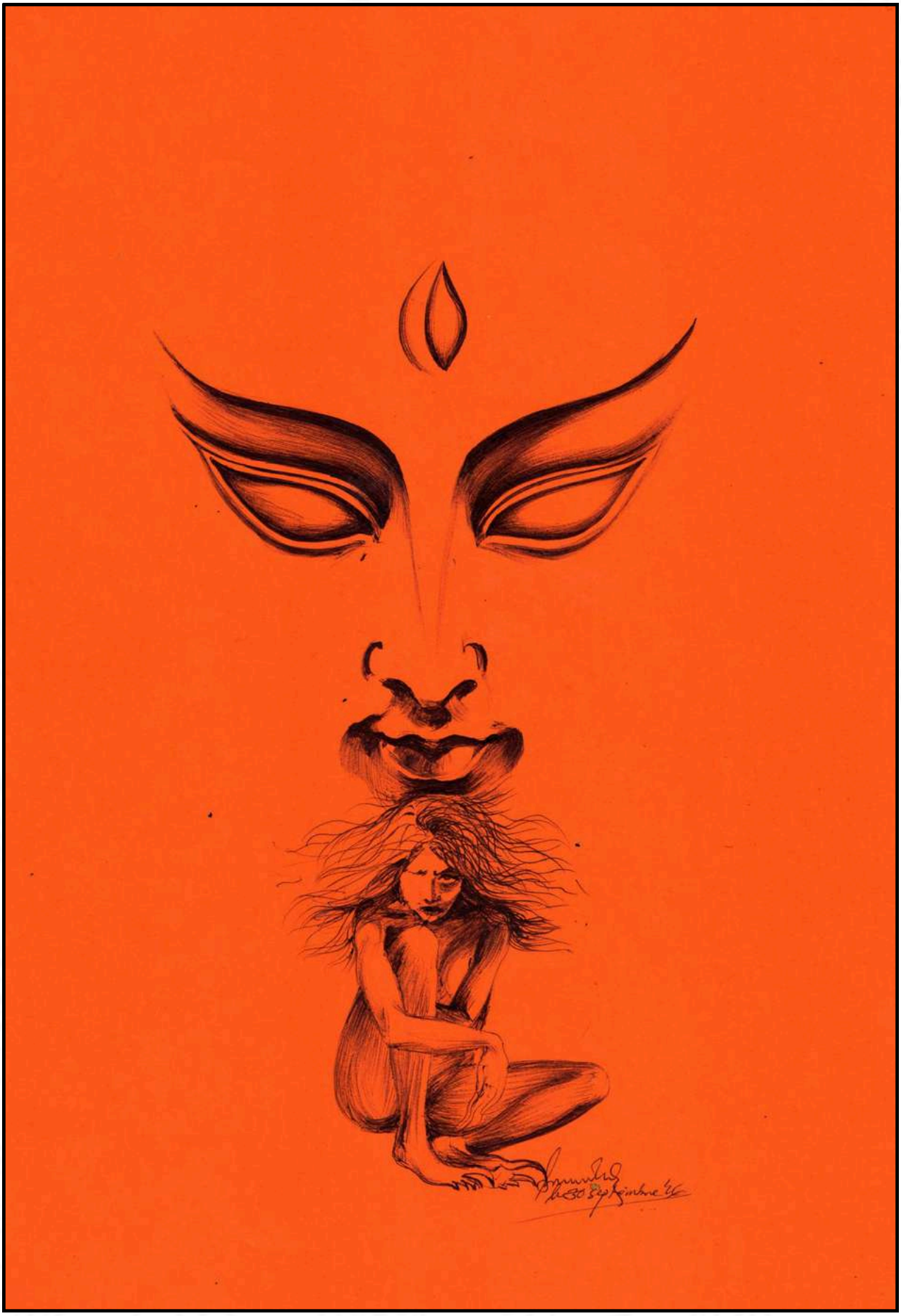

Durga - Sambita Modak [Pen on paper]

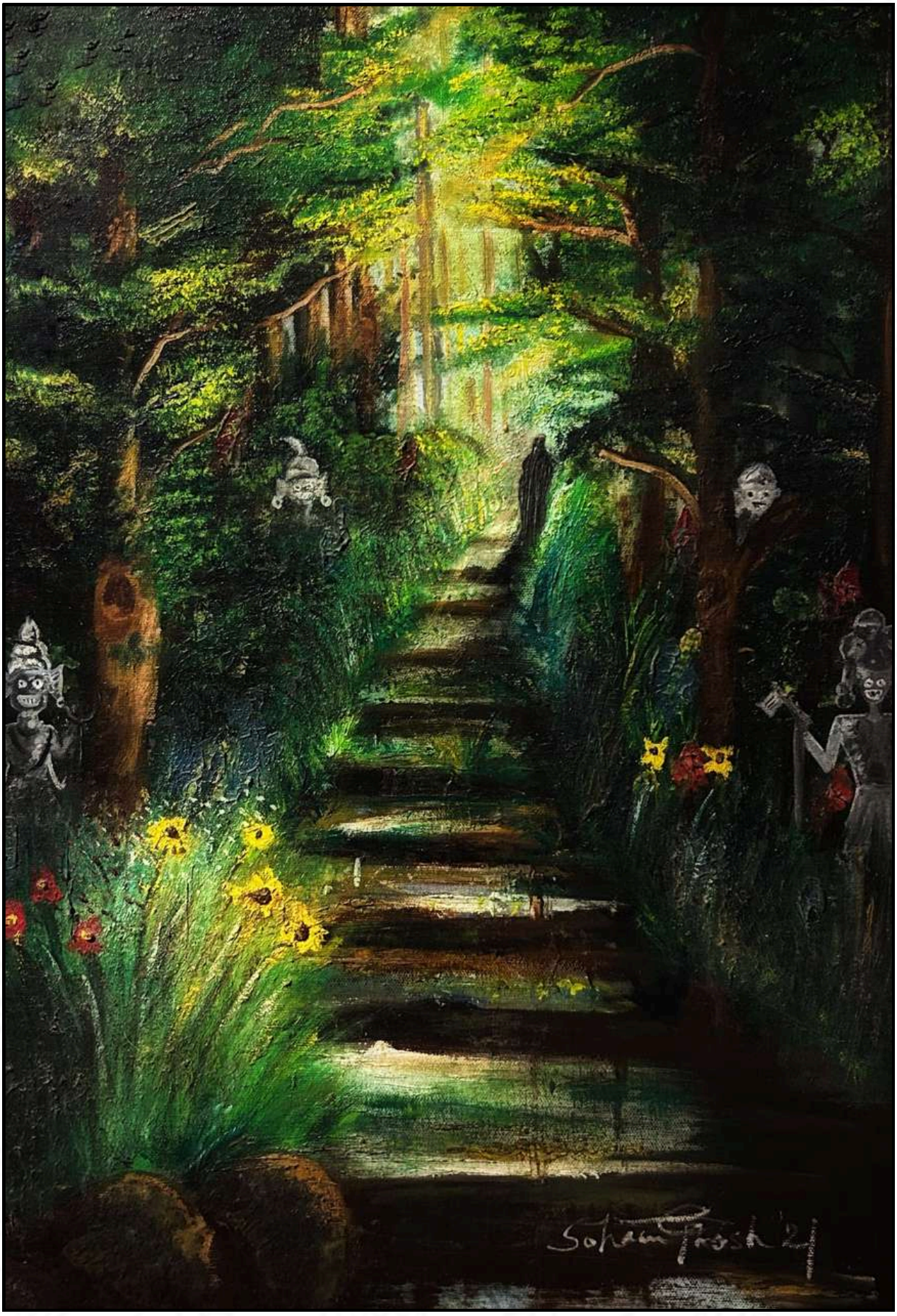

The house of the Ghost King - Soham Ghosh [Oil on Canvas]

Quadruplets - Jyotirmoy Paul

Fall - Kazi Rafsanjani Amin

ঘরে ফেরা

পাপিয়া দাস

বেশ কয়েকদিন টানা বৃষ্টির পরে আজ একটা রোদ ঝলমলে সকালে ঘুম ভেঙে পাউলের মনটা যেন খুশিতে ভোরে ওঠে। আজ প্রায় দু মাস হতে চললো পাউল পারসিলি তে রয়েছে। এটা মধ্যপ্রদেশের কাছে ছোটো একটা জায়গা। পাহাড়ের কোলে ছোট্ট একটা গ্রাম আর তার শেষ প্রান্তে এই "নব-দিগন্ত" - যেটাই গত দু মাস ধরে পাউলের আস্তানা।

পাউল আসলে জার্মানির এসেন শহরের বাসিন্দা, পেশায় ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এবং লাস্ট আট বছর ধরে E:ON Drive কোম্পানিতে কর্মরত ছিল কিন্তু আজ প্রায় সাত মাসের উপর ওর জীবনটা যেন এক বিচিত্র অনিশ্চয়তায় ভরে উঠেছে।

পাউল আর এমিলি সেই স্কুল জীবনের বন্ধুত্ব কাটিয়ে পাঁচ বছর ধরে ওদের বিবাহিত জীবনে তিন বছরের ম্যাথিউ কে নিয়ে বেশ ভালোই তো ছিল কিন্তু পাউল প্রোডাকশন ম্যানেজারের পোস্ট নিয়ে মিউনিখ এ মুভ করার পর থেকেই যেন ওদের ভেতরের সম্পর্কে একটু একটু করে চিড় ধরতে শুরু করে। সময়ের সাথে ঝামেলাটা বেড়ে এমন একটা পর্যায়ে চলে যায় যে সেখান থেকে সেপারেশন ছাড়া আর কোনো সমাধান পাউল-এমিলি বা ওদের পরিবার বা বন্ধুবান্ধবদের কাছেও ছিল না। পাউল ছোটো থেকেই একটু ঘরকুনো হওয়ার কারণে এমিলি ও ম্যাথিউর দূরে সরে যাওয়া টা ওর মানসিক এবং পেশাগত জীবনে প্রভাব ফেলতে শুরু করে। অনিয়মিত জীবনযাত্রা পাউল এর জীবন কে ক্রমশঃ অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে ঠেলে দিচ্ছিলো। দু-তিন বার ওর্য়ানিং এর পরে চাকরিটাও থাকলো না।

এই সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে পাউলের জীবনে। চাকরি চলে যাওয়ার পরে পাউল যখন জব এসেসমেন্ট সেন্টারে যায়, সেখানে ওর পরিচয় হয় প্রভাসের সাথে। প্রভাস আসলে বেঙ্গালুরুর বাসিন্ধা হলেও বেশ কিছু বছর ধরেই জার্মানিতে বাস করছে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পাউলের খুব কাছের বন্ধু হয়ে ওঠে প্রভাস।

পাউলকে এই সমস্যা থেকে বের করতে প্রভাস ই সমস্ত রকম যোগাযোগ করে ওকে দেরাদুনের এক আশ্রমে পাঠায়। প্রথম দিকে পাউলের ওখানে ভালো লাগলেও কিছুদিন পর থেকে ওর আবার একঘেয়েমি লাগতে শুরু করে। যে কারণে পাউল বেরিয়ে পরে ওখান থেকে এবং ঘুরতে ঘুরতে এই পারসিলি তে এসে পৌঁছায়। আর এখানেই অনিমেষ-সঞ্চিতার, এক গ্রাম অধিবাসী পরিবার ও তাদের ছেলে মেয়েদের নিয়ে গড়ে তোলা এই "নব-দিগন্ত" যেন পাউলকে এক অদ্ভুত ভালোলাগার টানে বেঁধে ফেলে।নিশ্ছিদ্র প্রকৃতির কোলে, সাতষট্টি একর জমির উপর গড়ে উঠেছে এই আশ্রম। এর মধ্যে প্রায় দশ একর জায়গা জুড়ে রয়েছে মন্দির,আধুনিক হাসপাতাল, স্কুল, লাইব্রেরি ও বেশ কয়েকটি কটেজ। আর বাকি জায়গা জুড়ে চলে অর্গানিক ফার্মিং এবং আছে দুটি বড় লেক যেখানে মাছ চাষ হয় আর রয়েছে গোশালা ও পোল্ট্রি ফার্মসহ গবাদি পশু পালনের সুব্যবস্থা।

অনিমেষ, তার স্ত্রী সঞ্চিতা এবং ছোটোবেলার বন্ধু নিখিল —তিনজনের নেতৃত্বে পুরো গ্রামের অধিবাসী পরিবার নিয়ে গত দশ বছর ধরে এই আশ্রমের কার্যক্রম সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। গত কয়েক বছর ধরে মোহিত ও সঞ্জয়ের মতো তরুণ উদ্যোক্তারা তাদের স্টার্টআপের মাধ্যমে এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় কাজের গতি ও পরিসর আরও বিস্তৃত হয়েছে।

"পাউল তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নাও, আমাদের ব্রেকফাস্ট করে বেরোতে হবে"- অনিমেষের ডাকে হঠাৎ

পাউলের খেয়াল হয় আজ তো রবিবার, শহর থেকে আশ্রমের ওষুধপত্র এবং আরো নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস আনার পালা। গত দুই মাস ধরে পাউল এই আশ্রম এর অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। এখানে এসে কেমন যেন মায়া আর ভালোলাগার বন্ধনে জড়িয়ে গেছে পাউল।
তাড়াতাড়ি স্নান সেরে পাউল খাবার ঘরের দিকে রওনা হয়। দেড়শো স্কয়ারমিটার এই ঘরটিতে চার বার খাবার ব্যবস্থা আছে এখানকার সবার জন্য। সকল ৮:৩০-৯:৩০ ব্রেকফাস্ট, দুপুর ১২:৩০-১:৩০ অব্দি লাঞ্চ, বিকেল ৪:৩০ তে টি-ব্রেক আর ৭:৩০-৮:৩০ তে ডিনার।
অনিমেষের ব্রেকফাস্ট প্রায় শেষ। কাপের কফিটুকু শেষ করতে করতেই পাউলকে ঢুকতে দেখে অনিমেষ বলে উঠল,"পাউল, তুমি ব্রেকফাস্ট সেরে নিখিলের থেকে লিস্টটা নিয়ে অফিসরুম হয়ে গাড়ির দিকে এসো। আমি হাসপাতাল হয়ে গাড়ির কাছে চলে যাচ্ছি।"পাউল মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। পুরি-ভাজি আর এক কাপ চা নিয়ে, প্রতিদিনকার মতো, জানালার পাশে টেবিলটায় গিয়ে বসল। এখানে ওর সকালটা এইভাবেই শুরু হয় — দূরের সবুজ পাহাড়গুলো দেখতে দেখতে ব্রেকফাস্ট করতে ওর বেশ ভালো লাগে।রোজকার মতো জানভী এসে ওকে আর এক কাপ চা দিয়ে যেত, কিন্তু আজ অত সময় নেই — অনিমেষ হয়তো গাড়ির কাছে অপেক্ষা করছে। এই ভেবে পাউল জানভীকে হাত নেড়ে আর এক কাপ চা দিতে বারণ করল।
ভারি ভালো মেয়ে এই জানভী — তেমনি কর্মঠ। ওর স্বামী বিহান এখানকার একজন ড্রাইভার, প্রতি শুক্রবার শহরে যাওয়ার সময় বিহানই ওদের গাড়ি চালায়। ওদের মেয়ে দিব্যা — পাঁচ বছরের ফুটফুটে একটা বাচ্চা, যে রোজ বিকালে পাউলকে এই আশ্রম এবং এর চারপাশ ঘোরানোর গাইড কাম খেলার সঙ্গী। বলা যেতে পারে এই দিব্যা-ও একটা বড়ো কারণ, পাউল এর এই জায়গাটাকে ভালো লেগে যাওয়ার। কাঁচ কাঁচ গায়ের রঙ হলেও দিব্যার চোখ দুটো যেন এক অদ্ভুত মায়ায় ভরা। ওর সঙ্গে সময় কাটালে পাউলের, ম্যাথিউর কাছে না থাকতে পাওয়ার অভাবটা অনেকটাই পূরণ হয়ে যায় বৈকি।
এই "নব-দিগন্তে" এখানকার আদিবাসী পরিবারের সমস্ত পুরুষ ও মহিলাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় — যেমন জৈব চাষ ,পশুপালন, মাছচাষ, রান্না-খাওয়ার মতো নানান বিষয় নিয়ে। এখানকার যাবতীয় কাজের দায়িত্ব তাঁদের উপরেই দেওয়া আছে। তাঁরা এখানকার কর্মী হিসেবেই কাজ করেন এবং মাসের শেষে তাঁদের কাজ অনুযায়ী বেতন দেওয়া হয়। একজন সরকারি কর্মচারীর মতোই এঁদের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন ও সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। অনিমেষ আর নিখিল মিলেই এই কাজের দেখাশোনা করে, যদিও মৃগাঙ্ক আর স্নিগ্ধা (অনিমেষ-সঞ্চিতার ছেলে মেয়ে) এই বিরাট কর্মযজ্ঞে ওরাও ওদের সাধ্যমতো সাহায্য করে। আর এদের বাচ্চাদের পড়ানোর দায়িত্ব প্রায় পুরোটাই সঞ্চিতার কাঁধে। বছর তিনেক আগে একদল কলেজ পড়ুয়া এই পারসিলি তে এসেছিলো এস্কার্সন এর জন্য তাদের বেশ কয়েক জনও মাঝে মাঝে ওর এডুকেশনাল সাপোর্ট সিস্টেম হিসাবে কাজ করে। সঞ্চিতা নিজের চেষ্টায় বাচ্চাদের জন্য ডিজিটাল ক্লাসরুমের ব্যবস্থা করেছে , যাতে এখানকার বাচ্চাদের যতটা সম্ভব উন্নত মানের শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। ভবিষ্যতে এদের যেন শহরের বড়ো বড়ো স্কুল বা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের সাথে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পরতে না হয়। শুধু তাই নয় এই ডিজিটাল ক্লাসরুমে সঞ্চিতা এখানকার অধিবাসী পরিবারের বড়দের জন্য সপ্তাহন্তে (শনি -রবিবার) ২-৩ ঘন্টা করে পড়ার ব্যবস্থাও করে রেখেছে। কারণ, ‘শিক্ষাই হলো এক বড় চাবিকাঠি’ - সব কিছুকে

বিচার বুদ্ধি দিয়ে বুঝে নেওয়ার এবং নিজেকে সঠিক পথে চালিত করার। এখানকার এই অধিবাসী পরিবারের ষাটোর্ধ যারা তাদের কাজ হলো মন্দির আর ফুল গাছের পরিচর্যা করা।এই এক বিরাট কর্মকান্ড এতো সুন্দর আর সুষ্টভাবে পরিচালিত হতে দেখে পাউল যেন বারে বারে বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে যায়।

অনিমেষ গুহ এবং সঞ্চিতা গুহ দুজনেই আমেরিকাতে বিখ্যাত নিউরোলজিস্ট এবং কার্ডিওলজিস্ট, দীর্ঘ দুই দশকের ও বেশি সময় লস অ্যাঞ্জেলেস এ ওদের নার্সিংহোম, ছেলেমেয়ে, বন্ধুবান্ধব এবং নিশ্চিন্ত জীবন ছেড়ে এক অন্য টানে জীবনটাকে অন্য ভাবে কাটানোর উদ্দেশ্যে লাস্ট দশ বছর ধরে নিজেদের টাকা পয়সা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে পারসিলির কাছে এই আশ্রম গড়ে তুলেছে। যদিও বিভিন্ন সময়ে ওদের দুই ছেলেমেয়ে এবং বন্ধুদের সহযোগিতা ও ওদের এই স্বপ্ন পূরণে অনেকটাই সাহায্য করেছে।

অনিমেষ আর সঞ্চিতা ওদের ছুটি কাটাতে বছরে একবার যখন দেশে আসতো সেই সময় ঘুরতে ঘুরতে এই পারসিলি জায়গাটা ওদের এতো পছন্দ হয়ে যায় যে ওদের অবসর জীবনটা এখানেই কাটাবে বলে স্থির করে। এই সময়েই ওরা পারসিলির পাশে একটা অধিবাসী গ্রামে এসে উপস্থিত হয়, কিছুটা সময় এখানে এই পরিবারগুলোর সাথে কাটানোর পর আর ওদের জীবনে অনেক কিছু না পাওয়ার বা না জানার পরেও ওদের সারল্য এবং আথিতেয়তা ওদের মুগ্ধ করে কিন্তু সেই সঙ্গে ওদের বাচ্ছাদের অনিশ্চয়তা পূর্ণ জীবন যা অনিমেষ-সঞ্চিতার সোসাইটির বাচ্চাদের থেকে আকাশ পাতাল তফাৎ ,যেটা অনিমেষের মনে একটা খারাপ লাগা তৈরী হয়। তখন থেকেই একটা স্বপ্ন ওর মনে দানা বাঁধতে শুরু করে। বেশ অনেক দিন বাদে সঞ্চিতার সাথে আলোচনা করে ওরা দুজনে মিলে ওদের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার কাজে লেগে পরে ,যার ফসল এই "নব-দিগন্ত"।

প্রায় প্রত্যেক শনি-রবিবার করে পাউল দিব্যার সাথে পারসিলির আশেপাশের জায়গা গুলোতে ঘুরে বেরায়। এই রকমই এক রবিবার বিকালে ওরা ঘুরতে বেরোয় ।পারসিলির কিছুটা পাশ দিয়ে একটা একটা নদী চলে গেছে । মজার বিষয় হলো, নদীটিতে জল কম থাকলে সেটি পায়ে হেঁটেই পার হওয়া যায়। পাউল আগেও কয়েকবার এখানে এসেছে, কিন্তু আজকের দিনটা একটু অন্যরকম; দিব্যা কথা দিয়েছিল সে আজ পাউলকে নিয়ে এখানে ঘুরতে আসবে। দিব্যার প্রস্তাবে পাউল রাজি হয়ে যায়। দুপুরে খাওয়ার পর, ওরা জঙ্গলের সরু রাস্তা ধরে নদীর দিকে রওনা দেয়। এই নদীর কাছে এলে পাউলের কেন যেন বারে বারে ওর ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যায়। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। গরমের ছুটিতে যখনি দাদু-ঠাকুমার কাছে ছুটি কাটাতে যেত ওখানকার বাল্ডেনয়্ নদীতে গিয়ে কায়াক চালানো আর নদীর ধারে পিকনিক করা ছিল সবচেয়ে আনন্দের। একবার অফিসের তরফ থেকে কোনো একটা পার্টির ব্যবস্থা করা হয়েছিল ওই নদীর উপরেই একটা মিনি শিপ ভাড়া করে। সেখানে বাকি কলিগ দের মতো পাউলও এমিলি আর ম্যাথিউকে নিয়ে গিয়েছিলো, অনেক রাত অব্দি সেই পার্টি চলেছিল —মাথিউর সেই দিনকার সেই আনন্দ যেন আজও ওর চোখের সামনে ভাসে।

এইসব ভাবতে ভাবতে পাউল দিব্যার সঙ্গে হাঁটছিল। কিন্তু খেয়াল করেনি যে দিব্যা কখন যেন খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে। হঠাৎ করে দিব্যার একটা চিৎকারে পাউল চমকে ওঠে। সামনে একটা পাথর ছিল, সেই পাথরে পা পিছলে পড়ে গিয়ে দিব্যার মাথায় আঘাত লাগে। মুহূর্তেই রক্ত বেরোতে শুরু করে। পাউল আর সময় নষ্ট না করে কোনো ভাবে দিব্যাকে কোলে তুলেই, ছুটে যায় নব-দিগন্তের

হাসপাতালে। কিন্তু ততক্ষণে দিব্যার বেশ অনেকটা রক্ত বেরিয়ে যাওয়ার কারণে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।যদিও ডঃ শর্মার তত্বাবধানে কিছুক্ষনের মধ্যেই দিব্যার জ্ঞান ফিরে আসে , যদিও কপালে চারটে স্টিচ করতে হয়। ডাঃ শর্মা রাতের দিকে পাউল, দিব্যার বাবা-মা, এবং অনিমেষ-সঞ্চিতা সহ বাকি সবাইকে নিশ্চিত করে জানালেন যে দিব্যা এখন সম্পূর্ণ সুরক্ষিত, আর চিন্তার কোনো কারণ নেই। দুপুরের পর থেকেই পাউল চরম উৎকণ্ঠায় ছিল। দিব্যার জন্য তার মন খুব খারাপ ছিল, আর সেইসাথে ভীষণ অপরাধবোধও কাজ করছিল বিহান আর জানভীর প্রতি। যদিও বিহান আর জানভী বারবার তাকে আশ্বস্ত করেছে—এটা নিছকই একটা দুর্ঘটনা, এটা যে কারোর সাথেই ঘটতে পারে, এবং এতে কারো কোনো দোষ নেই—তবুও পাউল নিজেকে ক্ষমা করতে পারছিল না। বরাবরের জন্য পাউল একটু নরম স্বভাবের, সে কারণে ছোটখাটো ঘটনাও তার মনে গভীরভাবে দাগ কাটে।

এখানে আসার পর থেকে পাউল যতবার দিব্যকে দেখেছে, ততবার তার চোখে ভেসে উঠেছে একটাই ছবি—ছটফটে, ভাঙাচোরা ইংরেজি আর মাতৃভাষা মিলিয়ে একনাগাড়ে চোখ মুখ নাড়িয়ে কথা বলতে থাকা একটা মেয়ে। সে, যেন একটানা বকবক করেই নিজের জায়গা করে নিতে চায় সব মানুষের মনে। কিন্তু আজ, দিব্যকে এভাবে নিস্তেজ, আধোজাগা-আধোঘুমের মধ্যে বিছানায় পড়ে থাকতে দেখে পাউল ওর মনের খারাপ লাগাটাকে কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছে না। তবুও, সঞ্চিতা আর জানভীর আশ্বাসে খানিকটা ভরসা পেয়ে, পাউল নিজের কটেজের দিকে ফিরে যায়।

রাতে হালকা খাওয়াদাওয়ার পর শুয়ে পড়ে সে। কিন্তু ভোররাতে হঠাৎ একটি দুঃস্বপ্নে তার ঘুম ভেঙে যায়—স্বপ্নে সে দেখে ম্যাথিউকে, আতঙ্কিত এক পরিস্থিতিতে, যেন কিছু হারিয়ে ফেলার ভয় চেপে বসেছে তার উপর। ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর পাউলের মনে হয়, এতদিন ধরে সে নিজের ক্যারিয়ার আর ইগোকে এতটাই গুরুত্ব দিতে গিয়ে এমিলি আর ম্যাথিউর উপর হয়তো অনেকটা অবিচার করে ফেলেছে। যে সময় ওর এমিলির পাশে থেকে মাথিউকে বড় করে তোলার কথা সেই মূল্যবান সময়টাই চলে যেতে বসেছে। এই কয়েক মাসে শুধু এমিলিই নয়, সেও ভুল করেছে। দায়িত্বের জায়গায় অনুপস্থিত থেকেছে, অথচ দাবি করেছে ভালোবাসার। এই দুই মাসে ‘নব-দিগন্তে’ এসে, এখানকার মানুষের জীবনযাপন, সম্পর্কের টানাপোড়েন, আর আন্তরিকতা দেখে পাউলের ভেতরের উপলব্ধি বদলাতে শুরু করেছিল। কিন্তু কালকের ঘটনার পর এবং আজ ভোররাতের সেই দুঃস্বপ্ন যেন সব আবেগকে এক জায়গায় এনে দাঁড় করিয়ে দিলো। পাউল আর দেরি করতে চায় না। সিদ্ধান্ত একটাই—এবার তাকে ফিরতে হবে এমিলি আর ম্যাথিউর কাছে। নিজের যা কিছু দায়িত্ব, যা কিছু অসমাপ্ত—সবকিছুকে গুরুত্ব দিয়ে আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। হয়তো এমিলি প্রথমে বুঝতে চাইবে না, বিশ্বাস করতে চাইবে না তার এই পরিবর্তনকে। কিন্তু তাতে কিছু আসে-যায় না। যত সময়ই লাগুক, পাউল জানে, ভালোবাসা আর দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে একদিন সে এমিলিকে বুঝিয়ে উঠতে পারবে।আর তাই দেরি না করে সিদ্ধান্ত নেয় দেশে ফিরে আসার।

পাউলের স্পষ্ট উপলব্ধি হয় —

জীবনের মানে নিজের ইগোকে আঁকড়ে ধরা নয়, বরং ভালোবাসায় নিজেকে ভাঙা। ত্যাগে যে আনন্দ, সেটাই জীবনের আসল রূপ।

বিছানা ছেড়ে উঠে হাত মুখ ধুয়ে স্নান সেরে পাউল অফিস রুমের দিকে যায় অনিমেষের খোঁজে - এবার ফেরার পালা।

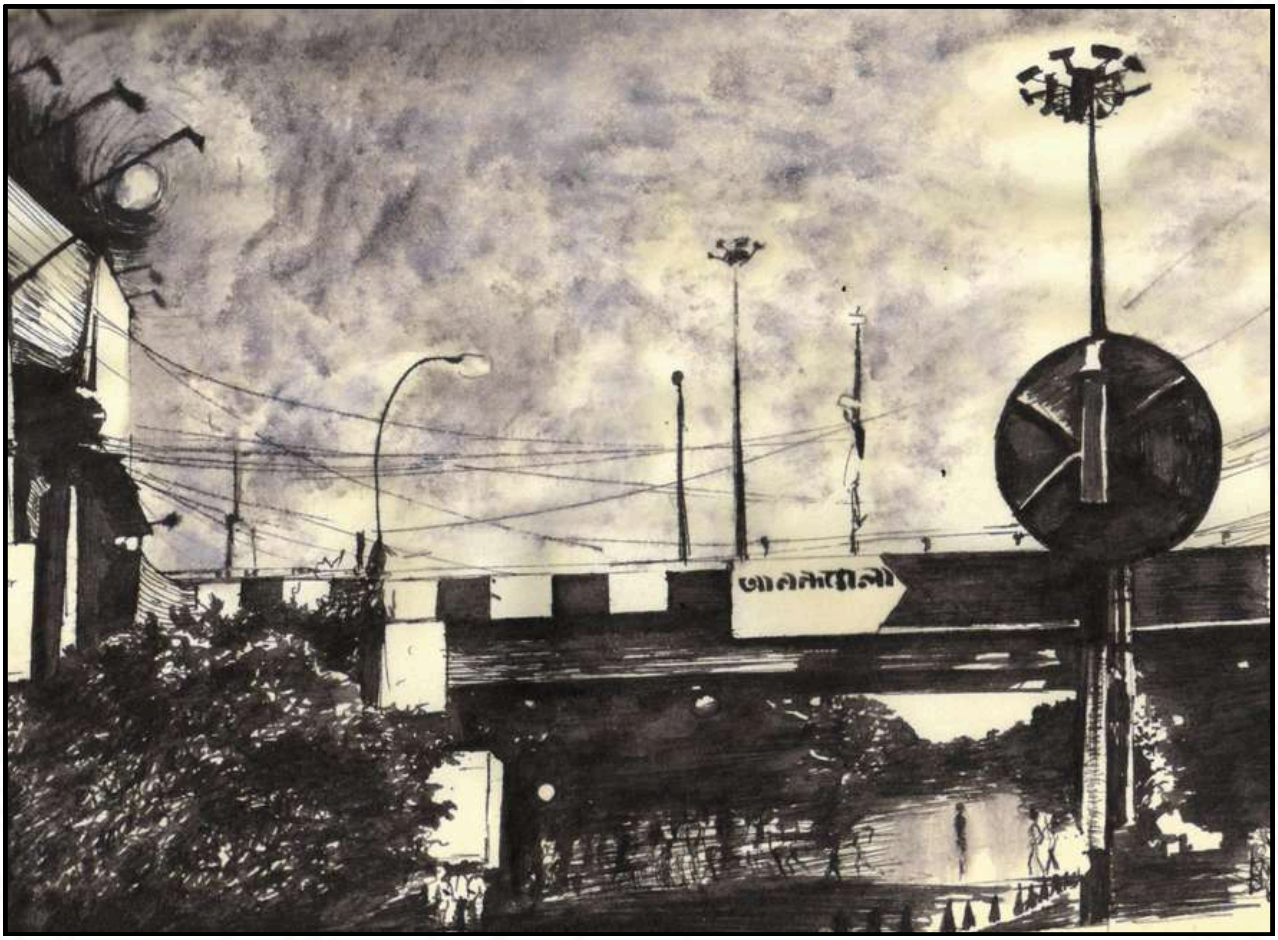

Tilottoma- Sambita Modak [Ink on paper]

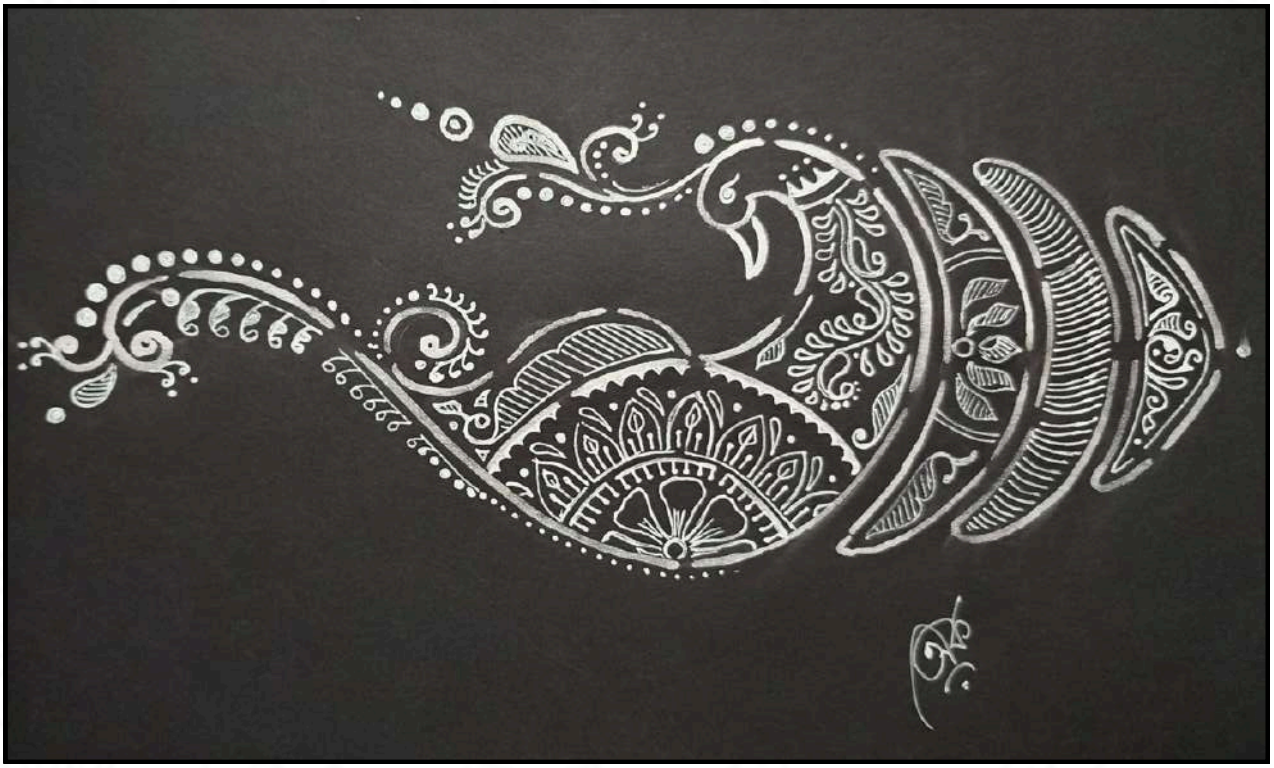

Sree - Arka Baksi [Pen on Paper]

REVIVE
INDIAN TASTE
IN ABROAD
with
INDI-US-TRY
Struggling to find
Indian Kitchen Appliances ?
Mixer Grinders, Wet Grinders, Multi Makers, Cookers
and their Parts ...
www.indiustry.com
+49 1521 892 8405
We are in Berlin and send through
Courier all over Europe

© BongoUstav Dresden (BUD) e.V.